কবিমানস

বারীন্দ্র বসু

পরিবেশক :
ষ্টাডিজ
২২, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী গৌরী বসু
রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন
২৪ বাগুইআটি রোড
কলিকাতা-২৮

মুদ্রাকর : শ্রীঅমলেন্দু বসু
শ্যামলী প্রিণ্টার্স
১৮৭, রামকানাই অধিকারী লেন,
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ, ১৩৬৬
এপ্রিল, ১৯৫৯

আমার সকল আদর্শের পথ প্রদর্শক,
সকল শুভ মূল্যবোধের উৎস, আমার
পরমারাধ্য পিতৃদেব ৺কৃষ্ণচন্দ্র বসুর
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে

নিবেদন

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য কম ঐশ্বর্যশালী নয়। তার সঙ্গে আমার এই বিনীত প্রচেষ্টাটুকু যোগ করলাম। আমার শ্রদ্ধেয় পূর্বসূরীদের সঙ্গে আমি সব সময় একমত নই, সমালোচনার ক্ষেত্রে ভিন্নতর চিন্তার স্বাধীনতা নিশ্চয়ই আছে। আর সার্থক কবিদের বৈশিষ্ট্য, প্রত্যেক যুগে যুগে তাঁদের কাব্যের ও কবিমানসের নব নব ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে। তবে আমি চেষ্টা করেছি নিরপেক্ষ যুক্তির মানদণ্ডটিকে সব সময় সক্রিয় রাখতে। কতদূর সফল হয়েছি, পাঠকেরা তার বিচার করবেন।

আমার এই গ্রন্থ প্রকাশের পিছনে আমার বন্ধু-সহকর্মীদ্বয় অধ্যাপক-সাহিত্যিক মানব সান্যাল ও বীরেন্দ্র দত্তের উৎসাহ বিশেষভাবে কাজ করেছে। শ্যামলী প্রিণ্টার্সের শ্রীঅমলেন্দু বসুর কাছ থেকেও অনেক সাহায্য ও উপদেশ পেয়েছি। এঁদের সকলকে আমার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

আরও কিছু সাহায্য পেয়েছি আমার বিশেষ স্নেহাস্পদ শ্রীমতী প্রীতি বসু ও কুমারী তাপসী মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। তারা আমার আন্তরিক ধন্যবাদার্হ।

প্রুফ দেখা কাজে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন শ্রীমতী গৌরীবসু। তাঁর সঙ্গে আমার যে-সম্পর্ক, তাতে তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া সাজে না।

বিনীত

বারীন্দ্র বসু

সূচীপত্র

সত্যেন্দ্রনাথের কবি-চেতনা

প্রথম অধ্যায়ঃ কবিস্বরূপ

[এক]

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-স্বরূপ আলোচনায় বিশেষ কয়েকটি প্রশ্নের সম্মুখীন আমাদের হতে হয়। তাঁর কবিতা পড়ে যে সংশয়গুলি আমাদের মনে জাগে তা হচ্ছে, কবি হিসেবে তাঁর মুখ্য বৈশিষ্ট্য কি? —তিনি কি তন্ময় (objective) কবি, না মন্ময় (lyric)? কবি হিসেবে তিনি কি গ্রামীণ মানসিকতাসম্পন্ন (rural), না নাগরিক চেতনাশ্রিত (urban)? তাঁর মধ্যে কি প্রাবন্ধিকের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ মনন চিন্তাশীলতার অতিরেক, না অসার্থক কবিজনোচিত হৃদয়াবেগের বাহুল্য? এবং সমস্ত প্রশ্নশেষে প্রধানতম যে কথাটি আমাদের সব থেকে বেশী ভাবায় সেটি হচ্ছে, তিনি কি কবি, না ছান্দসিক? হৃদয়ের যে গভীর অন্তস্তল থেকে স্বতোৎসারিত কবিতা আত্ম-প্রকাশ করে, তা কি সত্যেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে হয়েছে, কিংবা, নিজেকে কবি প্রমাণিত করবার জন্য তিনি বহিরঙ্গ-প্রধান কয়েকটি ছন্দের পরিচয় রেখে গিয়েছেন মাত্র। এবং শেষত, যদি বস্তুত তাঁর মধ্যে কিছুমাত্র প্রকৃত কাব্য-সত্তা থাকে, তবে তার স্বরূপ এবং লক্ষণ কি?

প্রশ্নগুলি একে একে বিচার করা যাক। সত্যেন্দ্রনাথকে আমরা গীতি-কবি (lyric Poet)-রূপে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত। গীতি-কবি বা মন্ময় কবি বস্তু-জগৎ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করলেও করতে পারেন, কিন্তু তিনি সেই বহির্জাগতিক উপাদানের আন্তরভাবকে নির্যাসিত করে এবং আপনার ভাবদৃষ্টির দ্বারা পরিস্রুত করে এবং সর্বোপরি নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে তাকে প্রকাশ করেন। সত্যেন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতা পাঠ করলে তার মধ্যে কবি-মানসের এই মাধুরী এবং নির্যাসিত ভাবের ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ খুব অল্পক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। তিনি তাঁর প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বাইরের জগতকেই উপকরণরূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু গীতিকবিরূপেও সেটা তত দোষাবহ হতো না, যদি তার পরিস্রুত মানস-মাধুরী-আশ্রিত রূপকে কবি কবিতায় প্রকাশ করতে পারতেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হয়নি। কখনও যে পারেননি তা নয়, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কবি বাইরের বস্তুকে

পুঙ্খানুপুঙ্খ ক্লাসিক দৃষ্টিতে অবলোকন করেছেন এবং তারই বস্তুবাদী চিত্র-রচনার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি বস্তুত্বকে উত্তরণ করতে পারেননি। এদিক থেকে তাঁকে গীতি-কবি বা মন্ময় কবি না বলে বস্তুবাদী কবি বলাই সঙ্গত। প্রকৃতপক্ষে ক্লাসিক কবির উপযুক্ত চিন্তাশীলতার অনুশীলন, স্বকীয় জ্ঞান-বৈদগ্ধ্যের প্রদর্শনস্পৃহা, আবেগ-স্বল্পতা এবং পরিপাটিরূপে উপস্থাপনার আকাঙ্ক্ষাই তাঁর কাব্যচেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাই তাঁর কবিতায় কৃত্রিম শোভাসৃষ্টির প্রচেষ্টা যত স্বত-প্রকাশিত, সহজ আন্তর-লাবণ্য তত নেই এবং তত্ত্ব ও তথ্যের চাপে কাব্যিক সৌন্দর্য নিষ্পেষিত।

পূর্বের অনুচ্ছেদে কবির বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে আমরা তাঁর ক্লাসিক চিন্তাশীলতার কথা বলেছি। এখানে একটু ভুল বুঝবার অবকাশ আছে। ক্লাসিক চেতনার ত্রয়ী বৈশিষ্ট্য—সামগ্রিকতা (all-comprehensiveness), মহত্ত্ব (sublimity) এবং প্রয়োগবাদী (pragmatic) দৃষ্টিভঙ্গি। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ বস্তুর যথাস্থিতরূপ যথেষ্ট দেখা যায়, কিন্তু ক্লাসিক দৃষ্টিভঙ্গির অপর বৈশিষ্ট্যদ্বয়, অর্থাৎ সামগ্রিক চেতনা এবং মহত্ত্ব বা গৌরব-সমুন্নতি, তার অতি স্বল্পতা। তাই তাঁর কবিতা তন্ময় বস্তুপুঙ্খানুপুঙ্খতা এবং মনন-প্রাধান্যে ক্লাসিকাল হলেও গৌরব-সমুন্নতির অভাবে ক্লাসিক নয়। কবির অতি পরিচিত 'আমরা' কবিতার যে কোন স্থান থেকে উদাহরণ নেওয়া যাক—

> স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে, 'বরভূধর' এর ভিত্তি,
> শ্যাম-কম্বোজে 'ওংকারধাম',—মোদেরি প্রাচীন কীর্তি।
> ধেয়ানের ধনে মূর্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর
> বিটপাল আর ধীমান,—যাদের নাম অবিনশ্বর।
> আমাদেরি কোন সুপটু পটুয়া লীলায়িত তূলিকায়
> আমাদের পট অক্ষয় ক'রে রেখেছে অজন্তায়।
> কীর্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি'
> মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।

তথ্যগত অযথার্থতার কথা বাদ দিচ্ছি। আলোচ্য কবিতাটিতে কবি ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাঙালীর বিশিষ্টতা প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা যেন কয়েকটি বিশেষ বাঙালীর কয়েকটি বিশেষ কৃতিত্বের পঞ্জিকামাত্র হয়েছে, বাঙালীর প্রকৃত পরিচয় (তার

মন এবং কর্ম, তার মানসিকতা এবং জীবন-চেতনা নিয়ে যে বাঙালী) হতে পারেনি। এইখানেই গীতিকবি হিসেবে কবি ব্যর্থ, ক্লাসিক কবি হিসেবেও। কেবলমাত্র 'ক্লাসিকাল' কবি হিসেবে তাঁর যা কিছু সার্থকতা। এই প্রসঙ্গে 'শূদ্র' 'মেথর' প্রভৃতি কবিতাও স্মরণ করতে পারি।

অবশ্য কখনও কখনও সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় ক্ষীণ গীতি-চেতনা যে পাওয়া যায় না তা নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কখনও কখনও। এবং এই গীতি-চেতনা তাঁর জীবন-চেতনার কেন্দ্র থেকে উৎসারিত নয়; এটিকে বলা যেতে পারে অভ্যাসজাত বা প্রচেষ্টাজাত। মনে রাখা দরকার সার্থক গীতি-কবির একটি কেন্দ্রীয় জীবন-প্রত্যয় থাকে। সেই প্রত্যয়টি অন্তরের কেন্দ্রস্থলে থেকে কবির কাব্য-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও বিকশিত করে তোলে। সত্যেন্দ্র-নাথের কাব্যে এই খাঁটি গীতি-কাব্যোচিত একটি বিশেষ প্রত্যয়ের সাক্ষাৎ দুর্নিরীক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের জীবনের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় যেমন সান্তের মধ্যে অনন্তের উপলব্ধি, কুমুদরঞ্জনের যেমন ঐশ্বরিক বিশ্বাস, তেমন কোন প্রত্যয় ঠিক সত্যেন্দ্রনাথে দেখা যায় না। তাই সার্থক গীতি-কবি তিনি নন। কিন্তু তবুও কখনও কখনও, হয়তো কবির অজান্তেই, তাঁর কবিতায় গীতি-চেতনার স্পর্শ লাগে। যে সৌন্দর্য এবং ব্যঞ্জনা গীতিকাব্যের প্রাণ, হৃদয়ের যে স্বচ্ছ প্রকাশে গীতি কবিতার সার্থকতা, কবি-মানসের মাধুরী মিশ্রণে বহির্জগতের গীতি কবিতায় যে পরিস্রুত রূপলাভ, খুব কমক্ষেত্রে হলেও, কখনও কখনও সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—

কতদিন হল বেজেছে ব্যাকুল বেণু
মানসের জলে ভিজেছে বিভোল বীণা,
তারি মূর্চ্ছনা—তারি স্বর রেণু রেণু,—
আকাশে বাতাসে ফিরিছে আলয়হীনা।
পরাণ আমার শুনেছে সে মধুবাণী,
ধরিবারে তাই চাহে সে তাহারে গানে,
হে মানসীদেবী! হে মোর রাগিনী রানী!
সে কি ফুটিবে না 'বেণু ও বীণার' তানে? (বেণু ও বীণা কাব্য)

আলোচ্য পংক্তিগুলির গীতিকাব্যিক বৈশিষ্ট্য অবশ্যই অস্বীকার করা যায় না। যে বৈদগ্ধ্য কবির হৃদয়-উত্তাপকে ক্ষীণ ও বাইরের বস্তুদৃষ্টিকে প্রকট

করেছিল, কবির মন্ময় প্রেরণাকে বাধাগ্রস্ত এবং তন্ময় চেতনাকে প্রধান করে তুলেছিল, তার প্রতি যেন অভিমান,—হৃদয়ের কথা, অন্তর-বেদনার বেণুরব সে কি অপ্রকাশিত, আশ্রয়হীন হয়েই রইবে? কবির কবিতার মধ্যদিয়ে তার বাণী কি ব্যক্ত হবে না? কবির এই বেদনাময় আকূতিই উপরিউক্ত পংক্তিগুলির মধ্যদিয়ে সার্থক গীতিকাব্যিক বৈশিষ্ট্যে বিধৃত হয়ে প্রকাশিত। কবির সার্থক গীতি-চেতনার আরও প্রকাশ আছে তাঁর 'কিশোরী', 'একটি চামেলীর প্রতি', প্রভৃতি কবিতায়।

[দুই]

কবির কাব্য-স্বরূপ সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্ন, তিনি কি গ্রামীণ মানসিকতাসম্পন্ন কবি, না নাগর-চেতনাশ্রিত? কিংবা দুয়েরই কিছু কিছু আছে তাঁর কাব্যে। থাকলে, কোনটির পরিমানই বা কি? যে শান্ত জীবন-চেতনা, স্নেহময় প্রাকৃতিক চিত্র এবং সরল মানবিক পরিচয় নিয়ে সত্যেন্দ্র-সমসাময়িক গ্রামগুলির পরিপূর্ণতা, সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে সেই পল্লীর চিত্র কতদূর লক্ষিতব্য? কবি যদি এই পল্লীচিত্রের সফল উপস্থাপনায় তাঁর কাব্যকে সার্থক করে তুলে থাকেন, তা হলে প্রশ্ন থাকে এই চিত্রগুলিতে কবির হৃদয়-রসের মিশ্রণ কত বিশুদ্ধ? এই পল্লীচিত্রগুলি কি কবির গভীর হৃদয়তল থেকে উৎসারিত?

এ কথা অবশ্যই সত্য যে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে পল্লীর স্বচ্ছ প্রাকৃতিক দৃশ্যের অভাব নেই। 'পাল্কীর গান', 'ইলসে গুঁড়ি', 'দূরের পাল্লা', 'বর্ষা' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে বিভিন্ন পরিবেশে এবং বিভিন্ন অবস্থায় পল্লী-প্রকৃতির যে সার্থক রূপায়ণ হয়েছে, তাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। স্তব্ধ রৌদ্রদগ্ধ দ্বিপ্রহরে নির্জন পল্লীপথের উপরে পাল্কীর একক যাত্রা অপূর্ব বাস্তবতার সঙ্গে 'পাল্কীর গান' কবিতাতে বিধৃত—

পাল্কী চলে!
পাল্কী চলে!
গগন তলে
আগুন জ্বলে!

অন্ধ গাঁয়ে
আদুল গায়ে
যাচ্ছে কারা
রৌদ্রে সারা !

কিন্তু কবিতাটি সম্পূর্ণ পড়বার পর এই প্রশ্নও মনে জাগে যে কবির পল্লী-চিত্রাশ্রিত কবিতাটির মূল প্রেরণা কি প্রকৃত পক্ষে তাঁর পল্লীচেতনা এবং পল্লীজীবনের গভীরতর প্রদেশে প্রবেশের পরিচয়বাহী অথবা ভিন্নতর কোন কারণ এর রচনার মূলে ? অন্যান্য পল্লী-কবিতা সম্পর্কেও একই প্রশ্ন জাগে। 'পাল্কীর গান' বা 'দূরের পাল্লা' কবিতা লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যায়, এদের রচনার পশ্চাতে যে প্রেরণা অধিকতর কার্যকরী তা হচ্ছে, একটি বিশেষ চলার ঢঙ্‌কে একটি বিশেষ চলনের ছন্দের মধ্যে ধারণ করা। পাল্কীর দুলকি চাল কিংবা ছিপের (এক জাতীয় নৌকো) নদী-তরঙ্গের উপর তরতর গতি,—এই দুটি গতির ছন্দ-চিত্র অঙ্কন করবার মুখ্য প্রেরণাই যেন এই দুটি কবিতা-রচনার উৎস-মূলে। প্রকৃত পক্ষে পল্লীর সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কে যুক্ত হয়ে পল্লীর প্রকৃতি ও মানুষের যে সামগ্রিক চেতনা এবং চিত্র ওয়ার্ডসওয়ার্থ রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির কাব্যে আমরা লক্ষ্য করতে পারি, তার দুঃখজনক অনুপস্থিতি সত্যেন্দ্রনাথে। তাই তাঁর কাব্যে পল্লী-চিত্র থাকলেও তাঁকে পল্লী-কবি বলা যায় না। অধিকন্তু তাঁর কাব্যে পল্লীর যে স্বল্প পরিচয় রয়েছে, তা কেবলমাত্র পল্লীর প্রকৃতির, কিন্তু পল্লীর মানুষের সরল অকপট জীবন-চেতনা এবং জটিলতাহীন বিশ্বাসময়তা (যা সত্যেন্দ্র-সমসাময়িক পল্লী-জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল), তার কোন পরিচয়ই তাঁর কাব্যে পাওয়া যায় না। তাই তাঁর কবি বৈশিষ্ট্যকে 'গ্রামীণ' শব্দদ্বারা চিহ্নিত করা যায় না।

তবে কি তাঁর কবি-মানসকে নাগর-চেতনাশ্রিত বলে নির্দেশ করা যায় ? বহিরঙ্গ বৈশিষ্ট্যপ্রধান নগর-জীবন এবং সমকালীন নাগরিক মানুষের অন্তর-চেতনার প্রকৃত পরিচয়-চিহ্ন কি তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত ? কাঠ-পাথর-লোহা, ফ্যাক্টরী-কারখানা-মিল, অফিস-আদালত, আন্দোলন-প্রতিবাদ-মুখরিত নগরীর পরিচয় ক্বচিৎ তাঁর কাব্যে লভ্য—

দিনে দীপ জ্বালি' ওরে ও খেয়ালি ! কি লিখিস্ হিজিবিজি ?
নগরের পথে রোল ওঠে শোন্ 'গান্ধিজী' ! 'গান্ধিজী'

বাতায়নে দেখ কিসের কিরণ ! নব জ্যোতিষ্ক জাগে !
জনসমুদ্রে ওঠে ঢেউ, কোন চন্দ্রের অনুরাগে। (গান্ধিজী)

কিন্তু এই নগর-পরিবেশের চিত্র তাঁর কাব্যের ক্ষীণতম অংশ অধিকার করে আছে। অতএব নগর-পরিবেশের কাব্যে প্রতিফলনের সার্থকতার দ্বারা যদি তাঁর কবি-মানসের নাগরিক-মানসিকতা নিরূপণ করতে হয়, তা হলে আমাদের সেখানে ব্যর্থ হতে হবে।

কিন্তু নাগরিক পরিবেশের কাব্যে প্রভূত প্রতিফলনেই যে একজনকে নাগরিক-চেতনাশ্রিত কবি বলা যাবে, তা নয়। আন্তর ভাবনায় কবি নাগরিক চেতনাশ্রিত কিনা, এবং তাকে কতদূর প্রকাশ করতে পেরেছেন, তার উপরই নির্ভর করে কবির নাগরিক মানসিকতার পরিমাণ। সত্যেন্দ্রনাথের কবি-মানসের নাগরিক-ভাবনার পরিমাণ নির্ণয় করতে হলে দেখতে হবে, সমকালীন নাগরিক ভাবচিন্তাকে তিনি তাঁর কবিতায় আশ্রয় দিতে পেরেছেন কিনা ; এবং পারলে কতদূর পেরেছেন। পাশ্চাত্ত্য দেশ থেকে যে নূতন নূতন ভাবাদর্শ সমকালীন ভারতবর্ষীয় মানসে আঘাত করছিল, তাদের দ্বারা আমাদের সমকালীন নাগরিক চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। একদিকে পাশ্চাত্ত্য বস্তুবাদী চেতনার আঘাতে আমাদের প্রাচীন অধ্যাত্মচেতনার ভিত্তি ধ্বসে পড়েছে, এবং তারই ফলে অবিশ্বাস, ক্লান্তি, হতাশা এবং লক্ষ্যহীন চলমানতার মধ্যে আমাদের জীবনের অবশেষ রচিত হয়েছে। জীবনের স্থির আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের ভিত থেকে চ্যুত হয়ে আমরা নুতনতর বিশ্বাসের দিকে হস্তপ্রসারণ করেছি। এই নুতনতর বিশ্বাসের ক্ষেত্র মানুষ। বিংশ শতকের পূর্বার্ধের নাগরিকতা উপরিউক্ত ক্লান্তি, হতাশা, অবিশ্বাস এবং মানবিকতার সম্মিলিত নির্যাস। নগরীর বিদগ্ধ চিন্তাশীল মানুষ ক্ষুদ্রতম মানুষের মধ্যে পর্যন্ত মহত্তম জীবন-বাণীকে আবিষ্কারের জন্য উদ্যোগী হয়েছে। কৃত্রিম ভেদ দূরে সরিয়ে রেখে সকল মানুষকে সমমূল্যে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রচেষ্টা চলেছে। বিদগ্ধ নাগরিক মানুষের এই মানব-চেতনা সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে স্পষ্ট স্বাক্ষর সম্পাত করেছে,—

মানিনা গীর্জা, মঠ মন্দির, কল্কি পেগম্বর,
দেবতা মোদের সাম্য-দেবতা অন্তরে তাঁ'র ঘর ;
রাজা আমাদের বিশ্ব-মানব, তাঁহারি সেবার তরে,
জীবন মোদের গড়িয়া তুলেছি শত অতন্দ্র করে। (সাম্যসাম)

এই নাগরিক মানবিকতার আরও পরিচয় তাঁর 'জাতির পাঁতি', 'শূদ্র', 'মেথর,, 'সেবাসাম' প্রভৃতি কবিতায়। এই সমস্ত কবিতাগুলিতে যে বেগদৃপ্ত উদ্দীপনা এবং প্রাণময় স্পন্দমানতা, তা কবির আন্তর ভাবনার গভীরতাকেই প্রকাশ করে।

কিন্তু তবুও প্রশ্ন শেষ হয় না। সমকালে প্রগতিবাদের আতিশয্যে মানবিকতা নিয়ে সাহিত্য রচনা একটি ভঙ্গির মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। প্রশ্ন জাগে, সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাগুলি কি তাই, কিংবা প্রকৃত মানবিক প্রত্যয় থেকে উৎসারিত। উপরিউক্ত কবিতাগুলি আন্তর ভাবনার গভীরতাকে প্রকাশ করে বটে, কিন্তু আন্তর-চেতনার বিশুদ্ধিকে কতদূর প্রকাশ করে? প্রশ্ন জাগে কবির অনুশীলিত বৈদগ্ধ্যের অভ্যাসজাত ওগুলি কেবলমাত্র কিনা, কিংবা কবির সমস্ত আন্তরজগতের সামগ্রিক অভিব্যক্তিজাত? মনে হয় যদি ঐ সমস্ত কবিতাগুলির পশ্চাতে প্রকৃত মানবিক প্রত্যয়ই থাকতো, তাহলে কবিতাগুলি কি অধিকতর গীতিকাব্যধর্মী হতো না? কবির প্রকৃত আন্তর চেতনার বিশুদ্ধিকে প্রকাশ করে অধিকতর মন্ময় হতো, কেবলমাত্র তথ্য বা যুক্তির তালিকামাত্র হতো না। তাই কবিতাগুলির পশ্চাতে প্রকৃত মানবিক প্রত্যয়াশ্রিত সমকালীন নাগরিক মানসিকতার পরিচয় কতদূর আছে, তা সংশয়ের বিষয়।

(এই মূল নাগরিক-চেতনার কথা বাদ দিলেও, নাগরিক মানুষের ক্লান্তি-ব্যর্থতা-শূন্যতাও কি তিনি ফোটাতে পেরেছেন? নগরের নিরালম্ব মানুষের সর্বশূন্য ব্যর্থতার পরিচয় তাঁর কাব্যে কতদূর লক্ষিতব্য? অল্প হলেও অবশ্যই আছে এবং সেই শূন্যতাকে তিনি নবযুগোচিত প্রত্যয়ের দ্বারা পূর্ণ করতে চেয়েছেন। সর্বশূন্য, ক্লান্ত, দগ্ধ নাগর-চেতনা নূতন বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে কেমন ভাবে বাঁচতে চাইছে, তার সার্থক গীতিকাব্যিক পরিচয় তাঁর 'চম্পা' কবিতায়,—

বনানী শোষণ-ক্লিষ্ট মর্মরি' উঠিল একবার,
বারেক বিমর্ষ কুঞ্জে শোনা গেল ক্লান্ত কুহু স্বর;
জন্ম-যবনিকা-প্রান্তে মেলি' নব নেত্র সুকুমার
দেখিলাম জলস্থল,—শূন্য, শুষ্ক, বিহ্বল জর্জর।
তবু এনু বাহিরিয়া,—বিশ্বাসের বৃন্তে বেপমান,
চম্পা আমি,—খর তাপে আমি কভু ঝরিব না মরি';

উগ্রমন্ত্রসম রৌদ্র,—যার তেজে বিশ্ব মুহ্যমান,—
বিধাতার আশীর্বাদে আমি তা সহজে পান করি।

স্বল্প হলেও এখানে অন্তত কবির নাগরিক বৈশিষ্ট্যের দৃঢ় এবং প্রকৃত লক্ষণ লক্ষ্য করা যায়।

আরও একটি দিক দিয়ে কবির নাগরিক মানসিকতা অনস্বীকার্য। আমরা পূর্বে কবির বস্তুবাদী চেতনা, জ্ঞান-বৈদগ্ধ্যের প্রদর্শন-স্পৃহা, আবেগ-স্বল্পতা এবং পরিপাটিরূপে সজ্জীকরণ-আকাজ্ক্ষার কথা প্রকাশ করেছি। এগুলি নাগরিক জ্ঞান-প্রকর্ষিত (Sophisticated) মানসিকতার পরিচায়ক।

[তিন]

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু পরিচয় আমরা দিতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু তবুও একটি প্রশ্নের এখনও সুমীমাংসা হলো না। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা রচনার পশ্চাতে বিশ্বস্ত কবি-প্রেরণা কত গভীর? যে উত্তপ্ত আবেগ প্রকৃত কবির অন্তরে নিহিত থেকে তাঁকে আন্দোলিত করে, যে দীপ্ত অনুভূতি ক্ষণ-মুহূর্তকে চিরন্তনত্ব দান করে, তাব পরিচয় তাঁর চেতনায় কতদূর ছিল। যে কবি-প্রেরণা কবিকে দীপ্ত করে, কবিতা লিখতে বাধ্য করে, তেমনতর প্রেরণা তাঁর ছিল কি? এবং যে রস-নিষ্পত্তিতে রচনার কাব্যত্বে উত্তরণ, তার পরিচয় কি তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাখতে পেরেছেন? কিংবা তাঁর কাব্য-রচনার পশ্চাতে এমন একটি মনের প্রকাশ, যা কেবলমাত্র প্রদর্শনী-রূপে বক্তব্যগুলিকে উপস্থাপিত করতে চায়। একথা কি মনে হয়না যে অজস্র ছন্দের উদাহরণ দেওয়ার জন্যই তিনি কাব্য রচনা করেছেন? প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য বহু ছন্দের উদাহরণ বাংলা কাব্যে প্রচলিত করা কি তাঁর কাব্যরচনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না?

কারও কারও মতে সত্যেন্দ্রনাথের চোখের ঠিক পিছনে ছিল কান দুটি। প্রকৃত কবি বাইরের বস্তু জগতকে অবলোকন করেন তাঁর দর্শন-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে, একথা অবশ্যই সত্য, কিন্তু অন্তরের গভীরতম তলদেশে সেই বস্তু জগতের পরিস্রুতি বা filtration চলতে থাকে; এবং তার পরে সেই পরিস্রুত বস্তুনির্যাস কবির স্বকীয় মানস-মাধুরীর মিশ্রণে সার্থক কাব্য হয়ে ওঠে। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ চক্ষুর দ্বারা দর্শিত বাইরের জগতকে আন্তর-চেতনার দ্বারা

পরিষ্কৃত না করেই, তার শাব্দিক চিত্রকে ধরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। তিনি দৃশ্যকে নিয়ে বহিরঙ্গে শব্দের জলতরঙ্গ বাজান, আন্তর-ভাবকে প্রকাশ করবার জন্য গভীর কবি-প্রেরণা অনুভব করেন না। আর তারই জন্য তাঁর কবিতাগুলি ছন্দের বিচিত্র উদাহরণ হিসেবে সার্থক হলেও কাব্য-চেতনার দিক দিয়ে রক্তাল্পতা রোগে ভুগতে থাকে। দু-একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। 'পাল্কীর গান' বা 'দূরের পাল্লা' সম্পর্কে আগেই বলেছি। সেই কবিতাগুলি পাঠ করলে বেশ বোঝা যায় কবি এক-একটি চলার ছন্দকে ছন্দের চলায় ধরতে চেয়েছেন। 'গ্রীষ্মের সুর' কবিতাটিও ধরা যাক। কবিতাটির আবেদন হৃদয়ের কাছে যত না হোক বিশেষভাবে যে চোখের কাছে, তা এই কবিতাটি দেখলে (পড়লে নয়) বুঝতে পারা যায়। যে কবি-প্রেরণা কয়েকটি তির্যক বর্গ-রূপের (square) মধ্যে কবিতার এক-একটি স্তবককে ধরতে চায়, তাকে আর যাই হোক বিশুদ্ধ কবি-প্রেরণা বলা চলে না। ছন্দের চিত্রটি দেখলেই কোন প্রেরণা এই কবিতাটি রচনার পশ্চাতে কাজ করেছে, তা বেশ বোঝা যায়।

হায়!
বসন্ত ফুরায়!
মুগ্ধ মধু মাধবের গান
ফল্গুসম লুপ্ত আজি, মুহ্যমান প্রাণ।
অশোক নির্মাল্য-শেষ, চম্পা আজি পাণ্ডু হাসি হাসে,
ক্লান্ত কণ্ঠে কোকিলের যেন মুহুর্মুহু কুহুধ্বনি নিবে নিবে আসে!
দিবসের হৈমজ্বালা দীপ্ত দিকে দিকে, উজ্জ্বল-জাজ্জ্বল অনিমিখ,
নিঃশ্বসিছে, নিঃস্ব হাওয়া, হুতাশে মূর্চ্ছিত দশদিক!
রৌদ্র আজি রুদ্র ছবি, আকাশ পিঙ্গল,
ফুৎকারিছে চাতক বিহ্বল,—
খিন্ন পিপাসায়;
হায়!

সত্যেন্দ্রনাথের 'পিয়ানোর গান' কবিতাটিকেও উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। পিয়ানোর সুর-সঙ্গীতকে তিনি সার্থকভাবে ধরেছেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। পিয়ানোর শব্দগত সুরকে তিনি ধরেছেন বটে, কিন্তু

তার মধ্য দিয়ে কোন কবি-ভাব প্রকাশ করতে পারেননি। কানের কাছে শব্দ তুলে তার আবেদন শেষ হয়ে গেছে, হৃদয়ের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছুতে পারেনি ;—

> টুল্ টুল্ টুক টুক
> টুক্ টুক্ টুল্ টুল্
> কোন্ ফুল তার তুল্
> তার তুল্ কোন ফুল ?
> টুক্ টুক্ রঙ্গন
> কিংশুক ফুল্ল
> নয় নয় নিশ্চয়
> নয় তার তুল্য।

কবিতাটি শোনামাত্র আমরা পিয়ানোর সুরটিকে সার্থকভাবে ধরতে পারি। কিন্তু শব্দগত harmony-কে অতিক্রম করে এখানে কোন বৃহত্তর হৃদয়গত harmony সৃষ্টি হয়নি বলে, এর মধ্য দিয়ে কোন কাব্যিক চিত্রকল্প আমাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হয় না। ঠিক একই ছন্দে রচিত রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা শুনলে আমরা বুঝতে পারি এই বিশেষ সুরটিকে বজায় রেখেও কেমনভাবে সার্থক কবি-প্রতিভা প্রকৃত কাব্যিক চিত্রকল্প প্রতিফলিত করতে পারেন—

> "ওগো বধূ সুন্দরী,
> তুমি মধু মঞ্জরী,
> পুলকিত চম্পার
> লহো অভিনন্দন—
> পর্ণের পাত্রে
> ফাল্গুন রাত্রে
> মুকুলিত মল্লিকা-
> মাল্যের বন্ধন।"

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দের এই শাব্দিকরূপকে ধরেও তার মধ্য দিয়ে কোন চিত্রকল্প প্রকাশ করতে পারেন না বলেই তিনি ছান্দসিকই রয়ে গিয়েছেন, কবি হতে পারেননি।

অতএব এ-কথা বলা যেতে পারে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা রচনার মুখ্য প্রেরণা কাব্য-প্রেরণা নয়, তা হচ্ছে ছন্দের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার আকাঙ্ক্ষা এবং এই আকাঙ্ক্ষা সর্বদা কবিতার প্রয়োজন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। তাঁর ছন্দ চেতনা মূলত একটি বিশেষ উদ্দেশ্যজাত। সেটি হচ্ছে বাংলা কাব্যের মধ্যে ছন্দের বিভিন্ন উদাহরণ নিয়ে আসা এবং বাংলা কবিতাকে বিচিত্র ছন্দের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি বাংলা কবিতায় বাউলের সুর, রুচিরা, মালিনী, মন্দাক্রান্তা এবং বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্য ছন্দ নিয়ে এসেছেন।

এক-একটি বিশেষ ছন্দ এক-একটি বিশেষ ভাব-প্রেরণাকে প্রকাশ করবার পক্ষেই সার্থক, এ-কথা সত্যেন্দ্রনাথ বুঝতে পারেননি। তাই তাঁর ছন্দ ব্যর্থ হয়েছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'যক্ষের নিবেদন' কবিতায় মন্দাক্রান্তা ছন্দ ব্যবহার করেছেন। কালিদাসের 'মেঘদূত' কবিতার মন্দাক্রান্তা ছন্দ তার ধীর বিলম্বিত তান এবং জলদ-গম্ভীর তালের পদসঞ্চার দ্বারা নিবিড় মেঘাবৃত আকাশের গম্ভীর সৌন্দর্যের বিরাট মহিমাকে অনাবৃত করে দিয়েছে—

> "ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক মেঘঃ
> সন্দেশার্থাঃ ক পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ।
> ইত্যৌৎসুক্যাদপরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে
> কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু॥" (পূর্ব মেঘ/৫)

কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের মন্দাক্রান্তা ছন্দ তার নৃত্যচপল গতিভঙ্গিমা নিয়ে সমস্ত ভাব-গাম্ভীর্যকে সম্পূর্ণ তরল ও শিথিল করে দিয়েছে—

> শৈলের পৈঠায় দাঁড়ায়ে আজি হায় প্রাণ উধাও ধায় প্রিয়ার পাশ,
> মূর্চ্ছার মন্তর ভরিছে চরাচর, ছায় নিখিল কার আকুল শ্বাস!
> ভরপুর অশ্রুর বেদনা-ভারাতুর মৌন কোন সুর বাজায় মন,
> বক্ষের পঞ্জর কাঁপিছে কলেবর, চক্ষের দুঃখের নীলাঞ্জন!

অতএব বলা যেতে পারে সত্যেন্দ্রনাথ ছান্দসিক হিসেবে সার্থক, কবি হিসেবে নন। অবশ্য কখনও নন, একথা ঠিক নয়। এ-কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে মাঝে মাঝে কাব্য-ব্যঞ্জনা ও চিত্রকল্প সৃষ্টিতে তাঁর কবিতা সার্থক হয়েছে।

আগেই দুটি উদাহরণ দিয়েছি ('বহুদিন হ'ল বেজেছে ব্যাকুল বেণু' বা 'আমারে ফুটিতে হল বসন্তের অন্তিম নিঃশ্বাসে')। এমনি আর একটা সার্থক উদাহরণ,—

তারে আসতে দেখে ঘাটের পথে
শিউলি ঝরে লাখে লাখে,
জুঁয়ের বুকে নিবিড় সুখে
প্রজাপতি কাঁপতে থাকে !
জলের কোণে ঝোপের তলে
কাঁচপোকা রঙ্ আলোক জলে
লুব্ধ ক'রে মুগ্ধ ক'রে
বৌ-কথা-কও কেবল ডাকে ;
আর হালকা-বোঁটা ফুলের বুকে
প্রজাপতি কাঁপতে থাকে। (কিশোরী)

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ

[এক]

"The perfume of pristine thought
can't in translation be caught."

বস্তুত প্রকৃত কবিতা যে ভাষান্তরিত করা যায় না, এ-কথা অনস্বীকার্য। জগৎ এবং জীবনের গভীর রহস্য কবির সমগ্র সত্তার ভিতর যে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে, তারই প্রেরণায় কবি সৃষ্টি-উন্মুখ হয়ে ওঠেন। কিন্তু পরিবেশ ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্য এই আলোড়নের প্রকৃতি বিভিন্ন কবিতে বিভিন্ন। যদিও সকল কবিরই লক্ষ্য প্রকৃতি এবং মানব-জীবনের রস-উদঘাটন, তথাপি পরিবেশের বিভিন্নতা এবং মানস-গঠনের বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রত্যেক কবির বাসনা-লোকের সঞ্চয় ভিন্নতর। কেবলমাত্র বাসনালোকই নয়, কবি নিজদেশ-জাত যে-সকল শব্দ, বাক্য-প্রণালী (Syntax), উপমা এবং অলঙ্কার প্রভৃতি ব্যবহার করেন, তাদের প্রত্যেকটিরই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। একটি বিশেষ

দেশের ভাষার মধ্যে সেই দেশের আকাশের রঙ্, মাটির গন্ধ, জলের স্পর্শ এবং বহুদিনাগত ঐতিহ্যের পরিচয় সম্পৃক্ত থাকে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বাংলা ভাষার 'কালো তমাল' শব্দদ্বয়ের মধ্যে কেবলমাত্র কৃষ্ণবর্ণের তমাল বৃক্ষের পরিচয়ই উদ্ঘাটিত নয়, সঙ্গে সঙ্গে এই দেশের ভূ-প্রকৃতি, পরিবেশ-পরিপ্রেক্ষা এবং কৃষ্ণ-cult সমন্বিত ঐতিহ্য ধারার ইঙ্গিতও প্রকাশিত। শব্দ-দ্বয়ের ইংরেজী অনুবাদে আমরা বাচ্যার্থ টুকুর হয়ত ভাষান্তর পেতে পারি, কিন্তু তাদের ঘিরে যে পরিমণ্ডল (ইংরেজদের ঐতিহ্য চেতনায় যা নেই এবং থাকা সম্ভব নয়,) তার অনুবাদ তো কিছুতেই সম্ভব নয়। এই যে এক-একটি বিশেষ শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে অনুষঙ্গরূপে সে দেশের পরিবেশ-পরিপ্রেক্ষা এবং ঐতিহ্যের সৌরভস্নিগ্ধ চিত্রকল্পতরঙ্গ সঞ্চারিত হতে থাকে, শব্দটির অনুবাদে সেই চিত্রকল্পের (suggestions) প্রতিভাস সম্ভব নয়। 'ধানের শিষ' বলবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা দেশের গ্রাম্য ভূ-প্রকৃতির মধ্যে বর্ধিত সমৃদ্ধ বাসনা-লোক-বিশিষ্ট একজন ব্যক্তির কাছে ব্যঞ্জনারূপে কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসের বাংলাদেশের একটি পরিপূর্ণ চিত্র ফুটে ওঠে। পক্ক শস্য-পরিপূর্ণ ক্ষেত্র, ধানের গন্ধ, চলমান গরুর গাড়িতে উচ্ছ্রিত ধানের স্তূপ প্রভৃতির চিত্র সামনে দেখা দেয়। কিন্তু 'ধানের শিষের' অনুবাদ 'paddy infloresence'-এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের উপরিউক্ত পরিচয় কি প্রকাশ করা সম্ভব? সম্ভব নয়, কারণ সেখানে শব্দদ্বয় আমাদের এই পরিবেশ-পরিপ্রেক্ষা দ্বারা অভিসিঞ্চিত নয়।

শব্দের সঙ্গে মিশে প্রকৃতি-পরিবেশের এই দ্যোতনা ছাড়াও, শব্দের soundগত আরও একটি ব্যাপার হতে থাকে। যাকে বলা হয় morphemic বা সমরূপমূলক। সম ধ্বন্যাত্মক কয়েকটি শব্দের তরঙ্গও আমাদের চেতনায় উত্থিত হয়। যেমন 'হিল্লোল' শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কল্লোল, উতরোল প্রভৃতি শব্দগুলিও আমাদের মনের অবচেতন স্তরে মৃদু কম্পন তুলতে থাকে। শব্দের এই দ্বৈত বৈশিষ্ট্য—যাকে একসঙ্গে আমরা বলতে পারি ব্যঞ্জনা—বিদেশী অনুবাদে সঞ্চারিত করা একেবারেই অসম্ভব।

তৃতীয়ত, প্রত্যেক প্রকৃত কবির থাকে নিজস্ব প্রকাশ-ভঙ্গি। 'style is the man'। কবির নিজস্ব জীবন-চেতনা ও জীবন-উপলব্ধি একটি বিশেষ আঙ্গিকের মধ্যেই রূপ পরিগ্রহ করে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। কবির স্বকীয় এই বিশেষ প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্যই তাঁকে অপর কবি থেকে পৃথক করে।

কবি-ব্যক্তিত্বের বিশিষ্ট মানস-চেতনা দ্বারা পরিক্রুত এই বিশেষ আঙ্গিককে অনুবাদের মধ্যে ধরা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার।

অতএব বলা যেতে পারে প্রকৃত কবিতা ভাষান্তরিত করা যায় না। অনুবাদকের কাজ, অনুবাদের মধ্যে মূল কবির বিশিষ্ট ভাব ও প্রকাশভঙ্গি ধরে দেওয়া। কিন্তু উপরের আলোচনায় আমরা বুঝলাম বিশেষ দেশকাল-সাপেক্ষিত কবির ধ্যান-ধারণা ও ভাষা-প্রকাশভঙ্গির অনুবাদ হওয়া অসম্ভব। তাছাড়া অনুবাদক নিজে যদি কবি হন, তাহলে তাঁর নিজের দেশকালজাত ধ্যানধারণা ও বিশিষ্ট উপলব্ধিও অনূদিত কবিতায় মিশে যাওয়া সম্ভব। এইজন্য অনুবাদে মূলের রসাস্বাদন সম্ভব নয়।

আর তারই জন্য অনুবাদকের কাজ বড় দুরূহ। নিজের দেশগত ও ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাসকে সংযত করে (যা কখনও সম্ভব নয়) যতদূর সম্ভব মূলের ভাষা ও ছন্দের আনুগত্য স্বীকার করে (যদিও তাতে কেবল বাচ্যানুবাদই সম্ভব, ব্যঞ্জনার অনুবাদ সম্ভব নয়) অনুবাদককে তাঁর কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। তারপর মাতৃভাষায় মূলকাব্যের উপমা-উৎপ্রেক্ষার প্রতিফলন ও সর্ববিধ বস্তুরূপের প্রতিষ্ঠা করতে পারলে তবে অনুবাদ কিছুটা সার্থকতার কাছাকাছি পৌঁছুতে পারে। কিন্তু এই আদর্শ অনুসরণ করা অসাধ্যপ্রায়।

সার্থক অনুবাদ যে কত অসম্ভব, তা একটি উদাহরণ দিয়ে দেখান যেতে পারে। Donne লিখেছিলেন—

> "For God's sake hold your tongue
> And let me love."

রবীন্দ্রনাথের মত শ্রেষ্ঠ কবির অনুবাদে তার রূপ দাঁড়াল—

> "দোহাই তোদের একটুকু চুপ কর
> ভালবাসিবারে দেরে মোরে অবসর।"

দুটি উক্তির মধ্যে কতই না পার্থক্য। Donne-এর পংক্তিদ্বয়ের মধ্যে বীর্যবত্তা, গাম্ভীর্য, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীন পরিবেশ-পরিপ্রেক্ষায় বিচরণরত ইংরেজের গৌরবসমুন্নত নির্ভীক উক্তি প্রকাশিত। আর তার স্থলে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে বাঙালী-জনোচিত ক্রন্দনময়তা, অনুরোধ উপরোধ ও হাবভাবের দীনতা প্রকাশমান। মূলের ছন্দের দৃঢ়পিনদ্ধ স্থির গাম্ভীর্য বাংলা অনুবাদের

শিথিলবিন্যাসের মধ্যে ঘোলো হয়ে গেছে। যেখানে রবীন্দ্রনাথের মত কবির ক্ষেত্রেও অনুবাদ এমন অসার্থক, সেখানে অন্য কোন ক্ষীণশক্তি কবির পক্ষে তা কতই না অসম্ভব !

[দুই]

অনুবাদক হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথের সার্থকতা বিচারে একটি মূল কবিতা ও তার অনুবাদের উদাহরণ নেওয়া যাক। সত্যেন্দ্রনাথ John Keats-এর 'La Belle Dame Sans Merci'-র অনুবাদ করেছিলেন 'নিষ্ঠুরা সুন্দরী' কবিতায়। প্রথমে Keats-এর কবিতাটির সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

1. 'O what can ail thee, knight-at-arms,
Alone and palely loitering ?
The sedge has wither'd from the lake,
And no birds sing.

2. 'O what can ail thee, knight-at-arms !
So haggard and so woe-begone ?
The squirrel's granary is full,
And the harvest's done.

3. 'I see a lily on thy brow
With anguish moist and fever-dew,
And on thy cheeks a fading rose
Fast withereth too.'

4. 'I met a lady in the meads,
Full beautiful—a faery's child,
Her hair was long, her foot was light,
And her eyes were wild.

5. 'I made a garland for her head,
And bracelets too, and fragrant zone ;
She look'd at me as she did love,
And made sweet moan.

6. 'I set her on my pacing steed
And nothing else saw all day long,
For sidelong would she bend, and sing
A faery's song.

7. 'She found me roots of relish sweet,
And honey wild and manna-dew,
And sure in language strange she said
"I love thee true."

8. 'She took me on her elf in grot
And there she wept, and sigh'd full sore,
And there I shut her wild wild eyes
With kisses four.

9. 'And there she lulled me asleep,
And there I dream'd—Ah ! woe betide !
The latest dream I ever dream'd
On the cold hill's side.

10. 'I saw pale kings and princes too,
Pale warriors, death-pale were they all ;
They cried—"La belle Dame Sans Merci
Hath thee in thrall !"

11. 'I saw their starv'd lips in the gloam
With horrid warning gaped wide,
And I awoke and found me here
On the cold hill's side.

12. 'And this is why I sojourn here
Alone and palely loitering,
Though the sedge is wither'd from the lake
And no birds sing.'

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ—

(১) কি ব্যথা তোমার ওহে সৈনিক
কেন ভ্রম একা ম্রিয়মান ?
শুকায় শেহালা হ্রদে হ্রদে, পাখী
গাহে না গান ।

(২) সৈনিক কিবা ব্যথিছে তোমায় ?
কেন বা শ্রীহীন ? কেন ম্লান ?
শাখা-মূষিকের পূর্ণ কোটর,
মরাইয়ে ধান।

(৩) কমলের মত ধবল ললাটে
কেন বা ছুটিছে কাল-ঘাম ?
কপোল-গোলাপ উঠিছে শুকায়ে
নাহি বিরাম।

(৪) "মাঠে মাঠে যেতে নারী সনে ভেট,
স্নন্দরী সে যে পরী-কুমারী,—
দীঘল চিকুর, লঘুগতি, আঁখি
উদাস তারি।

(৫) "গাথি মালা দিনু শিরে পরাইয়া,
কাকন, মেখলা কুসুমে গড়ি ;
চাহি' মোর পানে আবেগে যেন সে
ওঠে গুমরি।

(৬) "চপল ঘোড়ায় লইনু তুলিয়া,
অনিমিখ সারা দিনমান ;
পাশে হেলি' সে যে গাহিল কেবলি
পরীর গান !

(৭) "'আনি' দিল মোরে কত ফলমূল,
দিল বনমধু, সুধারাশি গো ;
কহিল কি এক অপরূপ ভাষে
'ভালবাসি গো !'

(৮) "অপ্সর বনে নিয়ে গেল মোরে,
নিশ্বাসি কত কাঁদিল হায় ;
মুদিনু তার ত্রস্ত নয়ন
চারি চুমায়।

(৯) "সেইখানে মোরে দিল সে নিদালি
স্বপন দেখিনু কত হায় ;
চরম স্বপন—তা'ও দেখেছি এ
গিরির গায়।

(১০) "মরণ-পাংশু কত রথী, বীর,
কত রাজা মোরে ঘিরিয়া ঘোরে,
কহে তারা 'হায় নিঠুরা রূপসী
মজাল্ল তোরে'

(১১) "দেখিনু তাদের ক্ষুধিত অধর,
লেখা যেন তাহে 'সাবধান'
জেগে দেখি আমি হেথায় পড়িয়া
গিরি শয়ান।

(১২) "সেই সে কারণে হেথা আমি আজ,
তাই ভ্রমি একা ম্রিয়মান ;
যদিও শেহালা মরে হ্রদে, পাখী
না গাহে গান।"

মূলের প্রথম স্তবক এবং অনুবাদের প্রথম স্তবক বিচার করলে দেখা যাবে, অনুবাদ মোটের উপর মূলের বক্তব্যকে উদ্ঘাটন এবং বাচ্যার্থকে প্রকাশ করতে পেরেছে। কিন্তু ঐটুকুই শুধু। মূলের ভাষা এবং ছন্দের মধ্য দিয়ে ক্লান্ত, হতাশ সৈনিকের যে বিষাদ-শ্রান্ত পদক্ষেপ, অনুবাদের পংক্তিগুলির চলনগত চঞ্চলতার মধ্যে তার পরিচয় প্রতিফলিত হতে পারেনি। মূলের ছন্দের অনুসরণ সত্ত্বেও, তার আভ্যন্তরীণ ভাব-ব্যঞ্জনা ঠিকমত অভিব্যক্তি পায়নি। সত্যেন্দ্রনাথ keats-এর মূল কবিতার ছন্দকে অনুকরণ করতে চেয়েছেন বটে, কিন্তু keats-এর কবিতার প্রত্যেক স্তবকের প্রথম দুই পংক্তির মধ্যস্থিত দীর্ঘায়িত তান এবং শেষ দুই পংক্তিতে হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে তাকে থামিয়ে দেওয়ার দরুণ যে ভাব-বিস্ময় জেগে ওঠে, সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদে তার একান্ত অভাব। দ্বিতীয়ত, মূল কবিতাটি পড়লে মনে হয়, ক্লান্ত সৈনিক যেন কবি নিজেই। কবির নিজস্ব মন্ময় অনুভূতিই সৈনিকের অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত।

কিন্তু অনুবাদটিতে যেন বাইরের থেকে বস্তুগতভাবে সৈনিককে দেখা হয়েছে। মন্ময় অনুভূতি নয়, তন্ময় বস্তুদর্শনই অনুবাদকের চেতনার নিয়ন্ত্রক। তার ফলে মূলের ভাব-গাঢ়তা (intensity of passion) অনুবাদের মধ্যে ধরা পড়েনি। সৈনিকের অপরিসীম বেদনা যেখানে মূল কবিতায় কবির নিজস্ব ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বিমিশ্রিত হয়ে প্রকাশিত, অনুবাদে সেখানে দূর থেকে বিচ্ছিন্নভাবে সৈনিককে দেখে তার প্রতি সহানুভূতি মাত্র।

অনুবাদের মধ্যে মূল শব্দ কেমনভাবে ব্যঞ্জনা হারিয়ে ফেলে তার দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। মূলের প্রথম স্তবকের তৃতীয় পংক্তিতে রয়েছে, 'The sedge has wither'd from the lake'। সত্যেন্দ্রনাথ 'lake' শব্দটির অনুবাদ করেছেন 'হ্রদ'। একে ভৌগোলিক অনুবাদ বলতে পারি। কিন্তু ইংরেজী-চেতনায় 'lake' শব্দের সঙ্গে যে পরিবেশগত অনুষঙ্গ সৃষ্টি হয়, 'হ্রদ' শব্দের দ্বারা বাঙালী মনে তেমনতর ভাবানুষঙ্গ সৃষ্টি সম্ভব নয়। বাঙলাদেশে 'জলাশয়' অর্থে 'হ্রদ' শব্দের ব্যবহার নেই। মনে হয় এখানে 'দীঘি' বা 'সরোবর' শব্দ মূলের অধিকতর ভাবানুগত হতো। যদিও আবার সে শব্দ ব্যবহার করতে গেলে ছন্দের ক্ষেত্রে গোলযোগ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল। দ্বিতীয় স্তবকে সৈনিকের বিশেষণরূপে keats বললেন, 'So haggard and so woe-begone',—সত্যেন্দ্রনাথ তার অনুবাদ করলেন, 'কেন বা শ্রীহীন? কেন ম্লান?'। 'haggard' শব্দের অনুবাদ দাঁড়াল 'শ্রীহীন'। কিন্তু ইংরেজী শব্দটির মধ্য দিয়ে যে 'লক্ষ্মীছাড়া'র ব্যঞ্জনা, 'শ্রীহীন' কথার মধ্য দিয়ে কি তা প্রকাশিত হতে পেরেছে? আমাদের মনে হয় 'শ্রীহীন' শব্দটিতে 'শ্রী' ধ্বনিটি থাকার ফলে সৈনিকটি যেন কতকাংশে শ্রীমানই হয়ে পড়েছে। মনে হয় এখানে 'ছন্নছাড়া' বা 'লক্ষ্মীছাড়া' শব্দই অধিকতর সার্থক হতে পারতো, যদি তাকে ছন্দের মধ্যে খাপখাওয়ানো যেতো। মূলের তৃতীয় স্তবকের দ্বিতীয় পংক্তি, 'with anguish moist and fever-dew', —সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ, 'কেন বা ছুটিছে কাল-ঘাম?' মূলের মধ্যে যে মৃদু, বিষাদাচ্ছন্ন অথচ স্নিগ্ধ সৌরভমণ্ডিত একটি বেদনার ইতিহাস, অনুবাদের 'কালঘাম' শব্দটি তাকে স্থূল ব্যঞ্জনাহীন গ্রাম্যতায় পর্যবসিত করেছে। মূলের চতুর্থ স্তবকের 'I met a lady in the meads' -এর অনুবাদ হয়েছে, 'মাঠে মাঠে যেতে নারী সনে ভেট'। এখানে 'lady'-র অনুবাদরূপে 'নারী' এবং 'met'-এর অনুবাদ রূপে 'ভেট' মূলের সমস্ত

ব্যঞ্জনাকে শুধু ধ্বংস করেই ক্ষান্ত থাকেনি, বাচ্যার্থকেও কুৎসিত করে ফেলেছে। এই স্তবকেরই শেষ পংক্তি 'her eyes were wild' এর 'wild' শব্দটির অনুবাদ সত্যেন্দ্রনাথে 'উদাস'। 'wild' আর 'উদাস' কি এক? 'wild'-এর বন্যতার মধ্যে কি 'উদাসে'র গভীরতা আছে, কিংবা 'উদাসে'র গভীরতার মাঝে 'wild'-এর বন্যতা? সমস্ত কবিতাটির মধ্যে যে ইঙ্গিত,— 'Frailty, thy name is woman', eyes এর বিশেষণরূপে 'wild' শব্দের সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু 'উদাস' শব্দের সঙ্গে সেই সামঞ্জস্য আসে কি? কিংবা keats-এর কবিতার অষ্টম স্তবকে 'eyes' এর বিশেষণরূপে দুবার 'wild' শব্দের ব্যবহারের দ্বারা বক্তার যে হৃদয়-উন্মোচিত passion-এর প্রকাশ অনুবাদের 'ত্রস্ত' শব্দের মধ্যে তার বিন্দুমাত্র পরিচয় আছে? তা ছাড়া সেখানে 'wild' শব্দের মধ্য দিয়ে গ্রাম্য নারীর যে আদিম বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ, অনুবাদের 'ত্রস্ত নয়ন' তাকে নাগর-চেতনাশ্রিত Sophistication-এর মধ্যে নিয়ে গেছে। সপ্তম স্তবকের 'I love thee true'-র অনুবাদ 'ভালবাসি গো'র 'গো' শব্দটি বক্তব্যের সমস্ত গভীরতাকে নষ্ট করে তাকে ন্যাকামিতে পরিণত করেছে। উদাহরণ অসংখ্য দেওয়া যায়, কিন্তু তার আর প্রয়োজন নেই।

[তিন]

অনুবাদের উপরিউক্ত ত্রুটির জন্য দায়ী সার্থক অনুবাদ করবার অসম্ভাব্যতা এবং সত্যেন্দ্রনাথের নিজস্ব অক্ষমতা। ইংরেজী পরিবেশ এবং ঐতিহ্যের সার্থক অনুবাদ বাংলায় করা সম্ভব নয়। কিন্তু যেখানে মূলের মধ্যে আমাদের পরিচিত ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং পরিবেশ অনুস্যূত, সেখানে অনুবাদে সত্যেন্দ্রনাথ অধিকতর সার্থক। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের 'Kali the Mother'-এর অনুবাদরূপে সত্যেন্দ্রনাথের 'মৃত্যুরূপা মাতা'কে স্মরণ করতে পারি। বিবেকানন্দ ভারতীয় এবং তাঁর কবিতার মধ্যে ভারতীয় পটভূমি, ঐতিহ্য, চেতনা এবং সংস্কারের প্রতিফলন। সত্যেন্দ্রনাথের ভারতীয় মানসিকতা মূল কবিতার ঐতিহ্যগত অনুষঙ্গেরই সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছে এবং উভয়ের বাসনা-লোক ও চিন্তা-পটভূমি এক হওয়ায় অনুবাদ অধিকতর

সার্থকতার কাছাকাছি পেঁ ৗছিয়েছে। বিবেকানন্দের 'Kali the Mother'—

The stars are blotted out,
The clouds are covering clouds,
It is darkness vibrant, sonant.
In the roaring, whirling wind
Are the souls of a million lunatics
Just loose from the prison house,
Wrenching trees by the roots,
Sweeping all from the path.
The sea has joined the fray,
And swirls up mountain-waves,
To reach the pitchy sky,
The flash of lurid light
Reveals on every side
A thousand, thousand shades
Of Death begrimed and black—
Scattering plagues and sorrows,
Dancing mad with joy
Come, Mother, Come !
For terror is thy name,
Death is in thy breath,
And every shaking step
Destroys a world for e'er.
Thou 'Time', the All-Destroyer !
Come, O Mother, Come !
Who dares misery love,
And hug the form of Death,
Dance in destruction's dance,
To him the mother comes.

সত্যেন্দ্রনাথের 'মৃত্যুরূপা মাতা'—

নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ্য-বায়ু-বেগ !
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দীশালা হ'তে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে !

সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরি-চূড়া জিনি'
নভস্তল পরশিতে চায় ! ঘোর রূপা হাসিছে দামিনী,
প্রকাশিছে দিকে দিকে তা'র,—মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর !—দুঃখ রাশি জগতে ছড়ায়,—
নাচে তা'রা উন্মাদ তাণ্ডবে ; মৃত্যুরূপা মা আমার আয় !
করালী ! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিশ্বাসে প্রশ্বাসে ;
তোর ভীম চরণ নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে !
কালী তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মাগো আয় মোর পাশে ।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়,—মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহু পাশে,—
কাল-নৃত্য করে উপভোগ,—মাতৃরূপা তারি কাছে আসে ।

যেখানে মূলেই ভারতীয় পটভূমি, তেমন আরও কিছু কিছু কবিতার অনুবাদ অনেকাংশে সার্থক হয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'জাহানারা', 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রভৃতি কবিতা স্মর্তব্য। সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদের সার্থকতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মূলের রস কোন ভাবেই অনুবাদে সঞ্চার করা যায় না। কিন্তু তোমার এই লেখাগুলি মূলকে বৃন্তস্বরূপ আশ্রয় করিয়া স্বকীয় রস-সৌন্দর্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ··আমার বিশ্বাস কাব্য-অনুবাদের বিশেষ গৌরব তাহাই। তাহা একই কালে অনুবাদ ও নূতন সত্য।' উক্তিটি অনেকাংশে যথার্থ। অনুবাদে যখন মূলের রস সঠিকভাবে সঞ্চারিত করা সম্ভব নয়, তখন অনুবাদকের প্রতিভা স্পর্শে সেগুলি যতটুকু নূতন কাব্যসৃষ্টির গৌরবলাভ করে, তাদের ততটুকুই সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত এই মানদণ্ডে বিচার করলে সত্যেন্দ্রনাথের অনেক অনুবাদ কবিতাকে কিছুটা নূতন কাব্যের গৌরব দেওয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে জাপানী কবি নোগুচির কবিতার অনুবাদ 'বর ভিক্ষা', জেবউন্নিসার কবিতার অনুবাদ 'যৌবন মুগ্ধা' কিংবা হাফেজের কবিতার অনুবাদ 'প্রিয়া যবে পাশে' উল্লেখ্য।

[চার]

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ কবিতার সার্থকতা অন্য আর এক ভাবেও বিচার করা যায়। সেটি জাতীয় শিক্ষা সংস্কৃতির দিক। বিভিন্ন দেশের জ্ঞান-ভাণ্ডার ও সাহিত্য-ভাণ্ডার থেকে কণা কণা মুক্তোচয়নে জাতীয় জ্ঞান-ভাণ্ডার ঐশ্বর্যশালী

হয়ে ওঠে। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর অনুবাদের মধ্য দিয়ে নানা দেশের জ্ঞানভাণ্ডার ও কাব্যকলার সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের পথ সুগম করে দিয়েছেন এবং কবিতার উপজীব্য বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য বহুলাংশে সম্প্রসারিত করেছেন। কবির অনুবাদ বহু-ভাষা বিস্তৃত। তামিল, তেলেগু, চীনা, জাপানী, ফারসী, ফরাসী, ইংরেজী প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের কাব্যের অনুবাদের মধ্য দিয়ে তিনি জাতির সম্মুখে নানা দেশের জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। বিভিন্ন দেশের নিকট থেকে আহরণ করেছেন বহু নূতন নূতন উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্প। এর ফলে বাংলা কবিতার প্রকাশ ক্ষমতা অনেক বেড়েছে। এই সকল অনুবাদের অনুসরণে মূল কাব্যপাঠের আকাঙ্ক্ষাও আমাদের অনেকাংশে বেড়েছে। তাছাড়া অনুবাদের জন্য বিভিন্ন দেশের বিচিত্র কাব্য-কবিতার অনুশীলনের ফলে শব্দ ও ছন্দের বহু বৈচিত্র্য তিনি উপলব্ধি করেছেন এবং বাংলায় সেগুলি ব্যবহার-প্রচেষ্টার দ্বারা বাংলা কাব্য-কলাকে বহুলাংশে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। এর ফলে তাঁর বাংলা মৌলিক কবিতায় দেখা দিয়েছে জাপানী ছন্দ, ফরাসী ছন্দ, সংস্কৃতের অনুষ্টুভ-মন্দাক্রান্তা-শার্দূলবিক্রীড়িত-মালিনী-রুচিরা প্রভৃতি ছন্দ, Young Lochinvar-এর ছন্দ এবং আরও বহু ছন্দ। শুধু নিজের কবিতাতেই নয়, বাংলা কবিতার ছন্দের ক্ষেত্রকে তিনি এইভাবে অনেক বাড়িয়েছেন। এদিক দিয়ে তাঁর অনুবাদচেতনার মূল্য অনস্বীকার্য।

কবি বিহারীলাল প্রসঙ্গে

[এক]

বাংলা গীতি কবিতার সূচনা ও বিহারীলাল

বাংলা সাহিত্যের ক্লাসিক চেতনা এবং গীতি-চেতনার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে কোন ভেদরেখা টানা যায় না। এ বিষয়ে ইংরেজী সাহিত্য সম্পর্কে Legouis এবং Cazamian যে কথা বলেছেন, বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে সেই একই কথা সত্য। তাঁরা বলেছেন—'Romanticism in England is much less clearly than in France the affirmation of an innovatory aesthetic creed, as opposed to an orthodox art. English literature, of a less codified and disciplined nature than that of France, was less subservient to an explicit system of rules which had been, so to speak, officially registered by enlightened opinion, incorporated in manners, observed by learned bodies, and upheld by an Academy......A new type of poetic creation, which for long has been in a state of obscure growth, now takes definite shape in certain pronounced traits, and declares its independence towards the past with a superior distinctness. (History of English literature by Legouis and Cazamian, Revised edition, reprinted in 1961, pp 996)। বাংলা সাহিত্য সম্পর্কেও উপরিউক্ত উক্তি অনেকাংশে যথাযথ। প্রাচীন যুগ থেকে প্রাগাধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের আন্তর চেতনায় গীতি-প্রবণতাই মুখ্য স্থান অধিকাব করেছিল, যদিও ক্লাসিক চেতনা যে একেবারেই ছিল না তা নয়। অবশ্য আধুনিক অর্থে সর্বাত্মক কবিমানস-প্রধান গীতিকাব্য প্রাচীন যুগে না থাকলেও বৈষ্ণব পদাবলী, লোকগীতিকা, শাক্ত পদাবলী, কবিগান প্রভৃতির মধ্যে গীতি-চেতনার সাক্ষাৎ দুর্লক্ষ্য নয়। মধ্যযুগেব বিপুল মঙ্গল-অনুবাদ, এবং জীবনীসাহিত্যে ক্লাসিক চেতনা ছিল বটে কিন্তু পাশ্চাত্ত্য বা সংস্কৃত ক্লাসিক দৃষ্টির মত তা খুব দৃঢ়ভিত্তিক নয়। আধুনিক যুগে এসে রঙ্গলাল থেকে আরম্ভ করে মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র এবং অন্যান্য আখ্যান কবিবা যে মহাকাব্য-আখ্যানকাব্য রচনা করলেন, তার মধ্যে গীতি-চেতনা অন্তর্লীন (latent) হয়ে রইল। আধুনিক যুগের মহাকাব্য-আখ্যানকাব্য রচয়িতারা (রঙ্গলাল, মধু,

হেম, নবীন) তাঁদের কাব্য রচনা করতে গিয়ে তার মধ্যে বা বিচ্ছিন্ন খণ্ড-কবিতাবলীর মধ্যে নিজস্ব কবিমানসের ও ব্যক্তিচেতনার অন্তরঙ্গ সৌরভটুকু মিশিয়ে দিয়েছেন বা ব্যক্তিগত তীব্র অনুভূতিকে প্রকাশ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের নব্য ক্লাসিক (neo-classic) যুগের কবিদের ক্লাসিক কাব্য-চেতনা ক্রমসঙ্কুচিত এবং তাঁদের মানস-অন্তর্লীন গীতিচেতনা যে ক্রমবিকশিত হয়ে চলেছিল, তা তাঁদের কাব্যধারা আলোচনা করলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়।

কিন্তু তবুও এ প্রসঙ্গে একটা কথা স্বীকার করতে হয় যে মহাকাব্যের এই ক্রমসঙ্কোচ এবং গীতি কাব্যের ক্রমবিকাশ সরল রেখায় হয়নি। নব্য আখ্যান ও ক্লাসিক কবিদের কাব্য-প্রেরণার মধ্যস্থিত গীতিকাব্যিক চেতনা ক্রমবিকাশের পথে সর্বাত্মক গীতিকাব্যের জন্ম দেওয়ার পূর্বেই আলাদাভাবে গীতিকাব্য রচনা আরম্ভ হয়ে গেছে। এ বিষয়ে কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের কথঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। ইংরেজী সাহিত্যের নব্য ক্লাসিক চেতনার অভ্যন্তরে যে গীতিচেতনা আত্মগোপন করেছিল ক্রমবিকাশের পথে সেটিই সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল গীতি কবিতারূপে। ক্লাসিক চেতনার পাশাপাশি অন্য কোন গীতিচেতনা সমান্তরাল রেখায় প্রবাহিত হয়নি বাংলা সাহিত্যের মত। সেখানে নব্য ক্লাসিকচেতনার অভ্যন্তরস্থ গীতিচেতনা পূর্ণ গীতিকাব্যিক রূপ পরিগ্রহ করলো ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে কোলরিজ ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'Lyrical Ballads'-এর মধ্যে। এবং তারই আরও সুপ্রতিষ্ঠিত রূপ অভিব্যক্ত হল ব্রাউনিং, বায়রণ, শেলী, কীটস্ এবং স্কটে। কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যের এই নব্যগীতি চেতনার মধ্যেও ক্লাসিক কাব্যাভ্যন্তরস্থ বৈশিষ্ট্যগুলি একেবারে অবলুপ্ত হয়ে গেল না। 'The cult of former values, and that of Pope are still to be found in Byron.' (Ibid)

সুতরাং ইংরেজী সাহিত্যে ক্লাসিক কাব্য থেকে তার গীতিকাব্যের ক্রমবিকাশ-ধারাটি সরলরৈখিক। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে ব্যাপারটি কিছুটা জটিল এবং ভিন্নতর।

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন-হেম-নবীন-অক্ষয়চৌধুরী-দ্বিজেনঠাকুর-ঈশান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মধ্য দিয়ে মহাকাব্য-প্রেরণা ক্রমসঙ্কুচিত এবং গীতিকাব্য-প্রেরণাটি ক্রমবিকশিত হয়ে চলেছিল। কিন্তু সেই প্রেরণা পূর্ণপরিণতিতে পৌঁছোনোর আগেই পাশাপাশি আর একটি ধারা গীতিকাব্যকে অভিব্যক্ত করে তুললো। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে যখন বঙ্কিমচন্দ্রের গীতিকাব্যধর্মী আখ্যানকাব্য

'ললিতা ও মানস' প্রকাশিত হয়েছে মধুসূদন তখনও সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা দেননি এবং হেম-নবীনের আগেই বিহারীলাল চক্রবর্তী তাঁর গীতিকাব্যসংগ্রহ 'সঙ্গীত শতক' (১৮৬২) নিয়ে আসরে দেখা দিয়েছেন। হেমচন্দ্রের মহাকাব্যধর্মী রচনা 'বৃত্র সংহারে'র (১৮৭৫) সঙ্গে সঙ্গেই সুরেন মজুমদারের ব্যক্তিক অনুভূতি উজ্জ্বল গীতিকবিতাসংগ্রহ 'মহিলাকাব্য' (১৮৮০) প্রকাশিত হয়েছে। আর মহাকাব্যরচয়িতাদের প্রধান রচনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের গীতিকবিতা পেয়েছি আরো আগে থেকে—মধুসূদনের আত্মসচেতন গীতিকবিতা 'বঙ্গ ভাষার প্রতি' এবং 'আত্মবিলাপ' রচিত হয়েছে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে, হেমচন্দ্রের গীতিধর্মী খণ্ড-কবিতাবলীর প্রথম সূচনা ১৮৭০-এ এবং নবীনচন্দ্রের ১৮৭১-এ। এর থেকে বুঝতে পারা যায় বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিক এবং লিরিক চেতনাকে কেন্দ্র করে দুই সুস্পষ্ট যুগবিভাগ সম্ভব নয়।

[দুই]

কবি-মানস

তবুও বিহারীলাল থেকেই বাংলা সাহিত্যে আধুনিক গীতি কবিতার সূত্রপাত ধরা হয়। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রথম গীতিকবিতাসংগ্রহ 'সঙ্গীত শতক' প্রকাশিত হয়। সমকালীন অন্যান্য কবিদের সঙ্গে বিহারী-লালের পার্থক্য, তাঁর মধ্যেই সর্বব্যাপক গীতি-চেতনার প্রথম প্রকাশ। বিহারীলালের কবিধর্ম অবিমিশ্রভাবে গীতিকাব্যিক। ব্যক্তি চেতনার ব্যাপক আলোড়ন তাঁকে কবিতা রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। সমকালীন অন্যান্য কবিদের কবিতা রচনার প্রেরণা ভিন্নতর। সেইজন্য বিহারীলালকেই বলা হয় আধুনিক গীতি কবিতার জনক। বিহারীলালের ধারার বিবর্তন-পথে দেখা দিয়েছেন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি। বিহারীলালের মতই এঁদের কাব্যেরও প্রধান লক্ষণ মানবহৃদয়ের সার্বজনীন বিশ্ব-অনুভূতি, নারী ও প্রকৃতির মধ্য দিয়ে প্রেম-আনন্দের আস্বাদন এবং আত্ম-উপলব্ধি।

রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে তাঁর গুরু বলে স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্র-নাথের উপর তাঁর প্রভাবের বিষয়টি সংশয়াতীত নয়, তবুও আগেই বলেছি রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য গীতি কবিদের মুখ্য বৈশিষ্ট্য বিহারীলালের সমধর্মী।

বাংলা গীতিকবিতার ক্ষেত্রে বিহারীলালকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ভোরের পাখী'। বস্তুত, পরবর্তীকালের সর্বব্যাপক আত্মভাবমূলক যে গীতিকবিতা দিনের আলোর দীপ্তিতে বাংলা সাহিত্যকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল, তার প্রথম প্রত্যুষের অস্ফুট আলো-আঁধারি প্রকাশ বিহারীলালে। আবার ভোরের পাখীর মতই তাতে উচ্ছ্বসিত কলরবই বেশী।

বিহারীলালের কবিমানস প্রস্তুত হয়েছিল প্রাচ্য অধ্যাত্ম-চেতনা, প্রাচ্য কাব্য-চেতনা এবং পাশ্চাত্ত্য নব্য রোমান্টিক কবি-চেতনার দ্বারা। কালিদাস, বাল্মীকি এবং প্রাচীন বাংলা কাব্য তাঁর কবিমানসের প্রেরণারূপে যেমন কাজ করেছে, তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অধিকতর অনুপ্রাণিত হয়েছেন পাশ্চাত্ত্য কবি সেকস্‌পীয়র, স্কট, মুর, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীটস এবং কোলরিজের দ্বারা।

বিহারীলাল গীতি-কবি; কিন্তু গীতি-কবির প্রকাশভঙ্গির মধ্যে যে পরিচ্ছন্নতা এবং অনুভূতির স্পষ্টতা থাকার দরকার তাঁর তা ছিল না। তাঁর প্রকাশভঙ্গি অস্পষ্ট এবং উচ্ছ্বাস-উদ্বেলিত। তাঁর সঙ্গে তুলনায় মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' বা 'বঙ্গ ভাষার প্রতি' কবিতার গীতি-মানসিকতা অনেক বেশী স্পষ্ট, অধিকতর ভাব-প্রকাশক এবং উচ্ছ্বাস-রহিত। অবশ্য মধুসূদনের ক্লাসিক-মানসিকতা গীতি-কবিতার আঙ্গিক বিষয়েও তাঁকে সাহায্য করেছে। কিন্তু বিহারীলাল মুখ্যত উচ্ছ্বাস-সর্বস্ব এবং সম্পূর্ণরূপে বস্তুচেতনা-বিচ্ছিন্ন। তাই যে সুসঙ্গত আঙ্গিকের মধ্যে গীতি-ভাবনা সার্থকতা লাভ করে তাকে তিনি ঠিক ধরতে পারেননি। বিহারীলাল স্বকীয় গভীর অনুভূতি-উপলব্ধিকে কাব্যে রূপদান করতে চেয়েছেন। কাজটি অত্যন্ত কঠিন এবং এপথে প্রথম পদচারীর পক্ষে হয়তো কঠিনতর। কিন্তু বিহারীলালের নিজস্ব আবেগ-অনুভূতিও যে তাঁর নিজের কাছেও খুব স্পষ্ট ছিল এমন কথাও বলা যায় না। তারই ফলে প্রকাশভঙ্গির দিক দিয়ে তিনি যথেষ্ট সাফল্যলাভ করতে পারেননি।

বিহারীলালের কাব্য গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে 'সঙ্গীত শতক' (১৮৬২), 'বঙ্গ সুন্দরী' (১৮৭০), 'নিসর্গ সন্দর্শন' (১৮৭০), 'বন্ধু বিয়োগ' (১৮৭০), 'প্রেম-প্রবাহিনী' (১৮৭১), 'সারদা মঙ্গল' (১৮৭৯), বাউল বিংশতি (বাং ১২৯৪), 'সাধের আসন' (বাং ১২৯৫-৯৬)।

ডঃ সুকুমার সেনের মতে, "প্রতিভার তুলনায় বিহারীলালের সৃষ্টি প্রচুর নয়, উপযুক্তও নয়। তাঁহার বাষ্পাকুল কবি কল্পনার মধ্যে আবেগের বেগ

কম হইলে লেখনীর দৌড় মস্থণতর হইত। তবে তাঁহার কবি প্রতিভায় খাদ ছিল না, এবং 'বঙ্গ সুন্দরী', 'সারদা মঙ্গল', 'সাধের আসন' প্রভৃতি কাব্যের স্থায়ী মূল্য যেমনই হোক আধুনিক বাংলা অন্তরঙ্গ গীতি কাব্যের আদি কবি তিনিই।"

সার্থক গীতিকবির একটি বৈশিষ্ট্য বিহারীলালের অবশ্যই ছিল। সেটি তাঁর বিশিষ্ট জীবন-প্রত্যয়। গীতি কবির চেতনার অভ্যন্তরে এই বিশিষ্ট প্রত্যয় কেন্দ্রীন (Nucleus)-রূপে অবস্থান করে তার সাহিত্যরূপকে অভিব্যক্ত করে। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে প্রাক্-বিহারীলাল অন্য কোন কবির এই কেন্দ্রীয় জীবন-প্রত্যয় ছিল না। তার ফলে তাঁদের কোন কোন কবিতা বিচ্ছিন্নভাবে গীতি-কবিতা হয়ে উঠলেও, তাঁদের ঠিক গীতিকবি বলা যায় না। এদিক দিয়ে বিহারীলালই বাংলা সাহিত্যের প্রথম গীতি কবি। আধুনিক বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে বিহারীলালের মধ্যেই আমরা প্রথম গীতি কবির উপযুক্ত এই জীবন-প্রত্যয় পাই। এই বিশিষ্ট জীবন-প্রত্যয তাঁর একটি বিশেষ সৌন্দর্য-দর্শন। কবির কাব্য-ধারার মধ্য দিয়ে এই সৌন্দর্য-দর্শন ক্রম-অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে। বিহারীলালের কবি-মানসের প্রেরণা এবং তাঁর কাব্যের বিশিষ্ট সুরটি বুঝতে হলে এই সৌন্দর্য-তত্ত্বটিকে উপলব্ধি করা এবং তার বিবর্তন-ধারাটি লক্ষ্য করা দরকার।

[তিন]

বিহারীলালের সৌন্দর্য-দর্শন

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, অনন্ত যখন বস্তুর মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়, তাকেই বলে সৌন্দর্য। রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তারই সমধর্মী চিন্তা বিহারীলালের সৌন্দর্য-চেতনায় লক্ষ্য করা যায়। বিহারীলালের মতে সমগ্র বিশ্বের অনন্তত্বের মধ্যে এক পরম নিরবয়ব সৌন্দর্য অন্তর্লীন হয়ে আছে। এই সর্বব্যাপ্ত সীমাহীন নিরবয়ব সৌন্দর্যই এই বিশ্বের বিভিন্ন খণ্ডরূপের সীমায়তির মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়ে আমাদের মনে সৌন্দর্যের অনুভূতি সঞ্চার এবং আনন্দ সৃষ্টি করে। নিরবয়ব পরম সৌন্দর্য যতক্ষণ বিশ্বের অনন্তত্বের মধ্যে বিলীন, ততক্ষণ তা আমাদের ধারণা এবং বোধের অতীত; যখন তা সীমায়িত খণ্ডরূপের মধ্যে অভিব্যক্ত, তখনই তা আমাদের বোধের মধ্যে ধার্য।

আরও একটু পরিষ্কার করে বললে বসতে হয়, বিশ্বের অনন্তত্বের মধ্যে ওতপ্রোত ভাব যখন খণ্ড রূপসীমার মধ্য দিয়ে আমাদের মনে আনন্দের সঞ্চার করে, তখনই তাকে আমরা সৌন্দর্যরূপে উপলব্ধি করি। প্রশ্ন থাকে, এই সৌন্দর্যবুদ্ধি কি বস্তুগত, না ব্যক্তিগত। বিশ্বের অনন্তত্বের মধ্যে কি সেই কার্যকারিতা যা আমাদের চেতনায় আনন্দের সঞ্চার করে আমাদের সৌন্দর্যবোধকে জাগিয়ে দেয়, কিংবা সীমাবদ্ধ বস্তুর মধ্যে সেই শক্তি যা অনন্তকে নিজ খণ্ডরূপের মধ্যে ধারণ করে আমাদের মনে সৌন্দর্যের উপলব্ধি সৃষ্টি করে, কিংবা আমাদের বিশিষ্ট মানসভঙ্গিই বস্তুতে সৌন্দর্যের আরোপ করে, আমরা 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' বস্তুকে সুন্দর করে তুলি, সুন্দররূপে দেখি। অনেকের মতে সৌন্দর্য মন্ময়,—মানুষের ব্যক্তিগত অনুভূতির ব্যাপার। অনেকের মতে সৌন্দর্য তন্ময়,—বস্তুর মধ্য দিয়ে অনন্তত্বের অভিব্যক্তিতেই সৌন্দর্যের উপলব্ধি। যাঁরা বলেন সৌন্দর্য মন্ময়, তাঁদের মতে, মনের এক সুখ-দুঃখাতীত প্রজ্ঞা-উজ্জ্বল অনুভূতিই সৌন্দর্যবোধ। এই অনুভূতি পরিবেশের উপর নির্ভরশীল নয়, এটি জন্মগত। আবার অনেকের মতে মনের কয়েকটি ধারণা যখন বস্তুর উপর আরোপিত হয়, তখনই সৌন্দর্যবোধের উদ্বোধন ঘটে। তাঁদের মতে—

> "আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
> চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
> আমি চোখ মেললুম আকাশে—
> জ্বলে উঠল আলো
> পুবে পশ্চিমে।
> গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর,—
> সুন্দর হল সে।" (আমি—রবীন্দ্রনাথ)

আসলে বস্তুজগৎ যখন আনন্দময় অনুভূতিতে মনের মধ্যে প্রতিভাত হয়, তার উপরই নির্ভর করে তার সৌন্দর্যময়তা। অর্থাৎ সৌন্দর্যের উপলব্ধির জন্য খণ্ডিত বস্তু-জগৎ চাই, বিশ্বের অনন্তত্বের মধ্যে বিলীন পরম সৌন্দর্যসত্তা চাই, বস্তুর মধ্য দিয়ে সেই সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি চাই, এবং তাকে ধারণ করবার উপযুক্ত পরিশীলিত ব্যক্তি-মানস চাই। অর্থাৎ সৌন্দর্য একাধারে বস্তুগত এবং ব্যক্তিগত, তন্ময় এবং মন্ময়। বিহারীলালের সৌন্দর্য-দর্শন এই শেষমতের অনুপন্থী। তাঁর জীবন-প্রত্যয়ই হচ্ছে, বিশ্বের মধ্যে যে

অনন্তত্ব অন্তর্লীন, তা বস্তুর মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়ে ব্যক্তির কাছে সৌন্দর্যরূপে প্রতিভাত হবে। কবির সমস্ত কাব্য-ধারার মধ্য দিয়ে এই অভিব্যক্তি ও উপলব্ধির ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

বিহারীলাল খণ্ডিত বস্তুসীমার মধ্যে এই অনন্তকে তথা পরম সৌন্দর্যকে সারা জীবন খুঁজে ফিরেছেন এবং উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। বিহারীলালের সৌন্দর্য-দর্শনের আরও একটি বৈশিষ্ট্য,—তিনি কখনও কখনও চেষ্টা করেছেন খণ্ডরূপ বাদ দিয়ে অনন্তকে, সৌন্দর্যকে বস্তু-অতীত পরমা অনুভূতিরূপে উপলব্ধি করতে। সম্ভবত আধ্যাত্মিক জগতে যাকে নির্বিকল্প সমাধি বলে তেমনতর প্রেরণা দ্বারা এক্ষেত্রে তিনি পরিচালিত হতে চেয়েছিলেন।

কবি অনন্ত সৌন্দর্যকে Symbolise করেছেন এক বিশিষ্ট দেবীরূপে। তাঁর নাম তিনি দিয়েছেন 'সারদা'। সারদা শব্দের অর্থ সরস্বতী—জ্ঞানের এবং সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কবি কল্পনা করেছেন, এই বিশ্বের কেন্দ্রস্থ সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সারদা, তিনি বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন বস্তুর খণ্ডরূপের মধ্যে প্রতিবিম্বিত। যেমন কোন ঘরের কেন্দ্রে কোন ব্যক্তি যদি অবস্থান করে এবং ঘরের সমস্ত দিকে যদি অসংখ্য দর্পণ থাকে, তবে সেই দর্পণসমূহে যেমন সেই ব্যক্তির অসংখ্য প্রতিরূপ প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি এই বিশ্বের কেন্দ্রস্থ সৌন্দর্য-দেবী সারদা; বিশ্ব যেন স্ফটিক আবরণের মত, বিচ্ছিন্ন বস্তুসমূহ যেন এক-একটি দর্পণ এবং বস্তুসমূহের উপর প্রতিফলিত হচ্ছে সারদার প্রতিবিম্ব। তাই তারা সুন্দর, তাই তারা আমাদের আনন্দের সৃষ্টি করে। কবি যেমন এই খণ্ডিত বস্তুর মধ্যে সারদা তথা সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে চান, তেমনি আবার বস্তুসীমাবহির্ভূত অনন্ত সত্তারূপেও তাঁকে ধারণা করতে চান নিজের চেতনায়। সান্তরূপে সারদা অভিব্যক্ত হন বিভিন্ন বস্তু এবং ব্যক্তির রূপে। প্রিয়া, মাতা, কন্যা ও বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তির মধ্য দিয়ে তিনি সীমাবদ্ধভাবে অভিব্যক্ত; আর 'সারদা' রূপ সর্বাত্মক অনুভূতির মধ্য দিয়ে তিনি সীমাহীন অনন্তরূপেই উপলব্ধীকৃত। কবি আরও উপলব্ধি করেছেন, এই সৌন্দর্য প্রেম এবং করুণা থেকে আলাদা নয়। সৌন্দর্যই কখনও প্রেমরূপে অভিব্যক্ত, কখনও বা করুণারূপে কখনও বা জ্ঞানরূপে কখনও বা মঙ্গলরূপে। সারদা সৌন্দর্যরূপে আমাদের মুগ্ধ করেন, মঙ্গলরূপে কল্যাণ করেন, জ্ঞানরূপে চিদাকাশ উদ্ভাসিত করেন। সান্তরূপের মধ্যেই এঁর উপলব্ধি সহজ, অনন্তভাবে এঁকে উপলব্ধি অত্যন্ত কঠিন। অন্তত: যতক্ষণ ইন্দ্রিয়গুলির

কার্যকারিতা পরিপূর্ণ জাগ্রত, ততক্ষণ সীমাতীতরূপে এঁকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়—

বিশ্ব গেছে, কান্তি আছে,—অনুভবে আসে না,
দেহখানি ধ্বংস হ'লে কান্তিটুকু থাকে না।
(সাধের আসন ১।১৫)

'সারদামঙ্গল' কাব্যে দেখা যায় কবি এই সৌন্দর্য-সত্তাকে একবার সীমার মধ্যে, একবার অসীমের মধ্যে এবং একবার ব্যাখ্যার অতীত আধ্যাত্মিক অনুভূতিরূপে উপলব্ধি করেছেন। কবির তিন অবস্থা—জাগর, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিতে,—সারদাও তিন প্রকার উপলব্ধি। জাগর অবস্থায় সারদা প্রেমের দেবতা, পৃথিবীর সম্পর্ক-সীমায় বা আত্মীয়তার বন্ধনে বিধৃত বিভিন্ন ব্যক্তি বা খণ্ডিত বস্তু, স্বপ্নাবস্থায় তিনি সৌন্দর্য-সত্তা এবং সুষুপ্তিতে তিনি এক অপূর্ব নির্বিকল্প আধ্যাত্মিক অনুভূতিরূপে কবিচেতনায় বিরাজমান। এমনই ভাবে বিহারীলালের এই সৌন্দর্য-তত্ত্বের মধ্যে আমরা সান্তের সঙ্গে অনন্তের, Real-এর সঙ্গে Ideal-এর এক সমন্বয় দেখতে পাই।

বিহারীলালের এই সৌন্দর্যতত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনের সাদৃশ্য আছে। রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের কাব্যসাধনা খণ্ড ও অখণ্ডের, সান্ত ও অনন্তের মিলন ঘটানর চেষ্টায় পর্যবসিত। রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতারও দূরাগত পদধ্বনি বিহারীলালের সারদার মধ্যে।

বহু য়ুরোপীয় কবির সৌন্দর্য-দর্শনের সঙ্গে বিহারীলালের সৌন্দর্য-দর্শন তুলনীয়। ইংরেজ কবি শেলীর আদর্শ সৌন্দর্যরূপিণী Intellectual Beauty-র সঙ্গে 'সারদা'র সাদৃশ্য আছে। সারদা সম্পর্কে কবি যখন উক্তি করেন,—

ব্রহ্মার মানস-সরে
ফুটে ঢলঢল্ করে
নীল জলে মনোহর সুবর্ণ-নলিনী,
পাদপদ্ম রাখি তায়
হাসি হাসি ভাসি যায়
ষোড়শী রূপসী বামা পূর্ণিমা যামিনী!

কোটি শশী উপহাসি
উথলে লাবণ্য রাশি,
তরল দর্পণে যেন দিগন্ত আবরে :
আচম্বিতে অপরূপ
রূপসীর প্রতিরূপ
হাসি হাসি ভাসি ভাসি উদয় অম্বরে!

(সারদা মঙ্গল-১/২১, ২২)

তখন শেলীর নিম্নলিখিত পংক্তিগুলির ভাব-চেতনার সঙ্গে তার সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায় না—

The awful shadow of some unseen power
Floats though unseen among us,—visiting
This various world with an inconstant wing
As summer winds that creep from flower to flower,—
Like moonbeams that behind some piny mountain shower,
It visits with inconstant glance
Each human heart and countenance ;
Like hues and harmonies of evening,—
Like clouds in starlight widely spread,—
Like memory of music fled,—
Like aught that for its grace may be
Dear, and yet dearer for its mystery.

(Hymn to Intellectual Beauty)

অবশ্য শেলীর সঙ্গে বিহারীলালের পার্থক্যও আছে। বিহারীলাল Ideal-এর জগতকে আন্তরদৃষ্টিতে উপলব্ধি করেছেন এবং বস্তুজগতকেও অস্বীকার করেননি। তিনি বস্তুর মধ্য দিয়েই Ideal-কে প্রতিফলিত দেখেছেন। কিন্তু শেলী Idea-কে রূপমুক্ত দেখতে গিয়ে হতাশ হয়েছেন এবং পরিশেষে কায়াকেই বিসর্জন দিয়েছেন। প্রাথমিক উপলব্ধিতে উভয়ের চেতনার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বিহারীলাল যখন বলেন,—

ফটিকের নিকেতন,
দশ দিক দরপণ,
বিমল সলিল যেন করে তক্‌তক্ ;

সুন্দরী দাঁড়ায়ে তায়
হাসিয়ে যেদিকে চায়,
সেই দিকে হাসে তার কুহকিনী ছায়া। (সা. ম. ১/২৩)

তখন শেলীর নিম্নের পংক্তিগুলির সঙ্গে তার ভাবগত মিল অনস্বীকার্য—

Spirit of BEAUTY, that dost consecrate
With thine own hues all thou dost shine upon
Of human thought or form,

কিন্তু তার পরেই শেলীর হতাশ ক্রন্দন—

Where art thou gone?
Why dost thou pass away and leave our state,
This dim vast vale of tears, vacant and desolate?
(Hymn to Intellectual Beauty)

তখন আর তারসঙ্গে বিহারীলালের সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। কারণ বিহারীলালে জগতের বিচিত্ররূপের মধ্যে কেন্দ্রীয় একেরই (সারদার) প্রতিফলন। তাঁর কাছে একও সত্য, বিচিত্ররূপও সত্য। কিন্তু শেলীর মতে 'The One remains, the many change and pass'.

শেলীর থেকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং কিট্‌স্-এর সঙ্গে বিহারীলালের সাদৃশ্য গভীরতর। কারণ ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কিট্‌স্ সীমা এবং অসীম, বস্তুজগৎ এবং বস্তুঅতীত ভাবজগৎ—দুইকেই স্বীকার করেছেন বিহারীলালের মত। ওয়ার্ডসওয়ার্থ নীড় ও আকাশকে মেলাতে চেয়েছেন, দুইয়ের সার্থক সামঞ্জস্যেই উপলব্ধি করেছেন সার্থকতা — 'True to the kindred points of Heaven and Home' আর কিট্‌স্ সীমার মধ্য দিয়ে অসীমকে উপলব্ধি করেন, সীমাবদ্ধ Grecian urn তাঁকে পৌঁছে দেয় সীমাতীত আনন্দময় চেতনার দ্বারপ্রান্তে, একটি Nightingale-এর সুরের মধ্যে তিনি উপলব্ধি করেন অনন্ত সৌন্দর্যের স্বাক্ষরসম্পাত, ঠিক যেমন বিহারীলালের পার্থিব আপনজনের মধ্যে ধরা দিয়েছেন অনন্তসৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী সারদা।

[চার]

কাব্যধারা : সৌন্দর্য-দর্শনের ক্রমপরিণতি

কবির কাব্যজীবনে ভাব-চেতনার বিবর্তন অনুধাবনীয়। গীতি-কবির সার্থকতা নির্ভর করে কেন্দ্রীয় ভাব-প্রত্যয়ের উপর। এটিই তাঁর কবিমানসের কেন্দ্রীন (Nucleus)। বিহারীলাল যতদিন এই কেন্দ্রীয় প্রত্যয়কে খুঁজে না পেয়েছেন ততদিন তিনি অস্থির এবং অস্থিত। খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রকৃতি ও নারী তাঁকে আকর্ষণ করছে কিন্তু শান্ত সমাহিত হয়ে তিনি তা উপলব্ধি করতে পারছেন না। 'বঙ্গসুন্দরীর' প্রথম স্তবকেই এই উদ্বেলতার আত্মপ্রকাশ—

> সর্বদাই হুহু করে মন,
> বিশ্ব যেন মরুর মতন ;
> চারিদিক ঝালাপালা,
> উঃ কি জ্বলন্ত জ্বালা !
> অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন।

কিংবা, 'নিসর্গ-সন্দর্শনে' প্রথম সর্গের শেষ স্তবকে—

> উথলিছে ভয়ানক চিন্তা-পারাবার,
> তরঙ্গের তোড়ে পোড়ে যতদূর যাই,
> আঁধার আঁধার তত কেবল আঁধার,
> ধাঁদায় কানার মত কূল হাতড়াই !

কেবল কবিভাবেই নয়, ভাবকে রূপায়িত করার প্রচেষ্টার মধ্যেও অস্বচ্ছ চিন্তা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য তার মধ্যেই পরবর্তী কবি মানসের ক্ষীণ পদসঞ্চারের দূরাগত ধ্বনির অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছে। 'সারদার' প্রাক্-পরিচয় বহন করে আছে পংক্তিগুলি,—

> শ্যামল বরণ, বিমল আকাশ,
> হৃদয় তোমার অমরাবতী ;
> নয়নে কমলা করেন নিবাস,
> আননে কোমলা ভারতী সতী। (বঙ্গসুন্দরী, ৩/১৩)

'নিসর্গ-সন্দর্শনে'ও উদ্বেলিত কবিমানস প্রকৃতির রূপের মধ্যে অলকাসুন্দরীকে দর্শন করে,—

শূন্যে শূন্যে মেঘমালে নাচিয়ে বেড়ায়,
চঞ্চলা চপলামালা তব নৃত্যকরী;
যেন মানসরোবর-লহরী-লীলায়
উল্লাসে সন্তরে সব অলকাসুন্দরী। (৪/৬)

কবি চেতনার সার্থক প্রতিষ্ঠা তাঁর 'সারদামঙ্গল' কাব্যে। কারণ এখানে এসে কবি প্রথম তাঁর সকল বিচ্ছিন্ন উপলব্ধিকে কেন্দ্রীয় প্রত্যয়ে বিধৃত করতে পেরেছেন। কবির সৌন্দর্যগত উপলব্ধি তার কুহেলিকা রূপ পরিহার করে তখন সৌন্দর্য-দর্শনে পরিণত হয়েছে, যে সৌন্দর্য-দর্শনের কথা আগেই বলেছি। এই তাত্ত্বিক প্রত্যয়ই তাঁর কাব্যকে পরিণতি দান করেছে।

'সারদামঙ্গল' কবির শ্রেষ্ঠ এবং সব থেকে পরিচিত কাব্য। এই কাব্যেই তাঁর প্রতিভা সুপরিস্ফুট। যদিও কবির অন্যান্য কাব্যের মত এটিতেও একটি ক্ষীণ আখ্যানস্রোত প্রবাহিত, তথাপি কবির ব্যক্তিগত মানসচেতনাকে ধারণ করে এ-খানি একটি সার্থক গীতিকাব্য। দেবী সরস্বতীর সঙ্গে কবির ভাবগত বিরহ-মিলনাকাঙ্ক্ষা ব্যক্তিগত কামনার মতই জীবন্ত এবং আন্তরিক হয়ে উঠেছে। তাঁর তীব্র আবেগ-আকূতি ব্যক্তিকস্পর্শে বাস্তব রূপ লাভ করছে। এই কাব্যেই তাঁর সৌন্দর্যতত্ত্বের যথোচিত অভিব্যক্তি।

'সারদামঙ্গলের' 'সারদা'র মধ্যে সব উপলব্ধির সমন্বিত আত্মপ্রকাশ। সারদা একই সঙ্গে সৌন্দর্য-প্রেম-করুণার পরিপূর্ণ সম্মিলন। কবি প্রথমে পরম বা অনন্ত সৌন্দর্যকে বাইরে অন্বেষণ করেছেন; কিন্তু সেখানে তার সাক্ষাৎ পাননি। অবশেষে খুঁজেছেন নিজের গৃহসীমায়, নিজের প্রিয়তমা স্ত্রীর মধ্যে তাকে অন্বেষণ করেছেন; কিন্তু সেখানেও কবি পরিপূর্ণ সার্থক হতে পারেননি। অবশেষে কবি উপলব্ধি করলেন, কেবলমাত্র খণ্ডে বা কেবলমাত্র অখণ্ডে নয়,—খণ্ড-অখণ্ড, সান্ত-অনন্তকে পরিব্যাপ্ত করে এই বিশ্ববিকাশিনী দেবী ওতপ্রোত রয়েছেন। তাই প্রথমে সীমা-অসীমকে মিলিত করতে না-পারার বেদনা কবিকে পীড়িত করেছে, পরে তিনি জাগতিক খণ্ডরূপের মধ্যেই অনন্ত সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করেছেন। তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত,—সান্তের মধ্য দিয়েই অনন্তের অভিব্যক্তি সম্ভব এবং ব্যক্তির অনুভূতিই সেই উপলব্ধির সঞ্চারক। কবি বুঝেছেন, বিশ্বব্যাপ্ত অনন্ত সৌন্দর্য সীমিত বস্তুরূপের মধ্যে প্রতিবিম্বিত

হচ্ছে। সারদাকে কবি একবার সীমার মধ্যে, একবার অসীমের মধ্যে ও একবার ব্যাখ্যার অতীত আধ্যাত্মিক অনুভূতি রূপে উপলব্ধি করেছেন এই কাব্যে। কবির তিন অবস্থা—জাগর, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিতে, সারদারও তিন প্রকার অভিব্যক্তি কবির উপলব্ধিতে ধরা পড়েছে। জাগর অবস্থায় সারদা প্রেমের দেবতা, স্বপ্নাবস্থায় বিশ্বের সৌন্দর্যরূপিণী এবং সুষুপ্তিতে গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতিরূপে কবি চেতনায় বিরাজমান।

'সারদামঙ্গলে' কবির যে সৌন্দর্য-উপলব্ধি পরবর্তী কাব্য 'সাধের আসনে' তারই সম্প্রসারণ। উপলব্ধি এখানে অধিকতর গভীর এবং পরিচ্ছন্ন। সারদামঙ্গলে পূর্ণ সৌন্দর্যের সঙ্গে (সারদার সঙ্গে) কবির মিলন যত না বাস্তব উপলব্ধি, তার অপেক্ষা অনেক বেশী মননজাত। উক্ত কাব্যের পঞ্চম সর্গে হিমালয় শৃঙ্গে সারদার সঙ্গে কবির মিলন হয়েছিল সত্য, কিন্তু সে-মিলন কাব্যের, অন্তরের নয়। তাই কবির অস্থিরতার ও উদ্বেলতার নিবৃত্তি তখনও হয়নি। তাই 'সাধের আসনে' আবার অন্বেষণ এবং, এই নিশ্চিত প্রতীতিতে উত্তরণ যে, বস্তুর মধ্য দিয়েই বাস্তবাতীতের প্রকাশ; লৌকিকের মধ্যেই অলৌকিক ব্যঞ্জিত, খণ্ডের মধ্যেই অখণ্ড আভাসিত; দেহব্যতিরিক্ত সৌন্দর্য-কল্পনা অসম্ভব। অলৌকিক সৌন্দর্যই কখনও দেহপরিচ্ছিন্ন 'কান্তি-সঙ্কলিত-কায়া-অপরূপ ললনা', কখনও 'প্রাণীর বেশে/খেলা কর দেশে, দেশে,/যুগলে যুগলে সুখ-সম্ভোগে বিহ্বল', আবার কখনও '…জননী, পিতা/নন্দিনী, রমনী মিতা,/প্রেম-ভক্তি-স্নেহ-রস-উদার-উচ্ছাস'। এই কেন্দ্রীয় সৌন্দর্য স্বরূপিনী আছেন বলেই, বিশ্বের সকল কিছুর মধ্য দিয়ে সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি. আবার বস্তুবিশ্বরূপ দর্পণ আছে বলেই, তাব মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সৌন্দর্য-সর্বৈকসত্তা প্রতিবিম্বিত। যদি বস্তুবিশ্ব না-থাকে তবে সেই কেন্দ্রীয় সৌন্দর্য-সারাৎসারের উপলব্ধি অসম্ভব হয়ে উঠবে,—

বিশ্ব গেছে, কান্তি আছে,—অনুভবে আসে না,
দেহখানি ধ্বংস হ'লে কান্তিটুকু থাকে না।

তেমনি, এ বিশ্ব থেকে
কান্তিখানি দূরে রেখে,
চাও, বিশ্ব-পানে চাও—
কিছু কি দেখিতে পাও?

কোথা তুমি, কোথা আমি,
কে তোর জগৎ-স্বামী,
সূর্য চন্দ্র দিন রাত
কিছু নহে প্রতিভাত। (সাধের আসন, ১/১৫, ১৬)

কবি বুঝেছেন বস্তুহীন Abstract সৌন্দর্য আকাশ-কুসুম কল্পনা মাত্র।

সারদামঙ্গল থেকে সাধের আসনে কবি মানসের ভিন্নতর আরও এক প্রকার বিবর্তন অনুধাবনীয়। সারদামঙ্গলের কবি রোমান্টিক অস্থিরতায় চঞ্চল, সেখানে পরমকে একান্ত করে পাওয়ার অন্তহীন অন্বেষা। কিন্তু সাধের আসনের কবি পরমকে প্রাপ্তিতে স্থির, শান্ত অচঞ্চল। সারদামঙ্গলে কবি ছিলেন রোমান্টিক, সাধের আসনে মিস্টিক। পূর্বের চঞ্চলতা তন্ময়তায় নিমজ্জিত। কবির উপলব্ধি, রহস্যময়তাই সৌন্দর্যের প্রাণ, রহস্যকে উন্মোচন করে কেন্দ্রীয় সত্যকে আবিষ্কার-প্রচেষ্টা হাস্যকর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। কবির পরিণততর উক্তি—

রহস্য ভেদিতে আর আমি চাব না।
না বুঝিয়া থাকা ভাল,
বুঝিলেই নেবে আলো।
সে মহা প্রলয়-পথে ভুলে কভু ধাব না।

রহস্য বিশ্বের প্রাণ,
রহস্যই স্ফুর্তিমান,
রহস্যে বিরাজমান ভব

* * *

রহস্য, রহস্যময়—
রহস্যে মগন রয়।
খুঁজিয়া না পেয়ে তাকে
সবে 'মায়া' বোলে ডাকে
আদরের নাম তার বিশ্ববিমোহিনী।

(সা. আ., ১/২১, ২২, ২৫)

এই উপলব্ধির ফলেই রূপ-বৈচিত্র্যের মধ্যে তাঁর তাত্ত্বিক ঐক্য আবিষ্কার। কবি রূপান্তরিত হলেন সাধকে।

[পাঁচ]

বাণীরূপ

কবির সার্থকতা ভাবের সার্থক বাণীরূপ সৃষ্টিতে। প্রকাশই কবিত্ব। বিহারীলালের কবিমানসের সার্থকতা বিচারে তাই অবশ্যই তাঁর শিল্প কৃতিত্ব বিচার্য। মোহিতলাল যদিও বলেছেন, বিহারীলালের ভাষায় rhetoric বা declamation-এর লেশ নেই বলে যদি তাঁর উচ্চ প্রাণপূর্ণ ভাব আমাদের চিত্তস্পর্শ না করে তাহলে বুঝতে হবে আমাদের কাব্য-সংস্কার মিথ্যা ও কৃত্রিম, তবুও তাঁর কবিকৃতির শেষতম বিচার নির্ভর করবে এই ভাবের উপযুক্ত আঙ্গিক সৃষ্টিতে। সার্থক বাণীরূপের অভাবে তাঁকে ভাবুক বলতে পারি, কিন্তু কবি বলতে পারা যায় না। তাছাড়া অনুভূতি যদি যথার্থ হয়, তার বাণীরূপও সার্থক হতে বাধ্য।

কিন্তু বিহারীলালে তা হয়নি। হৃদয়াবেগের ফেনোচ্ছ্বসিত প্রবলতার জন্ত তাঁর কাব্য শিথিলবিন্যস্ত এবং অস্পষ্ট। কবি তাঁর কাব্যের মধ্যে একটি অরূপ অনুভূতিকে রূপদান করবার চেষ্টা করেছেন এবং তাতে ব্যর্থ হয়েছেন। অবশ্য অরূপ অনুভূতিকে রূপধৃত করা বড়ই কঠিন। সৌন্দর্যের সূক্ষ্মতত্ত্বকে রূপসীমায় প্রকাশের সেই গভীরতলসঞ্চারী ক্ষমতা তাঁর ছিল না। রবীন্দ্রনাথ যেমন ভাবে জীবন-দেবতাকে, শেলী যেমন ভাবে Intellectual Beauty-কে সংহত রূপের মধ্যে ধারণ করেছিলেন, বিহারীলালের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। তাঁর উপলব্ধি উৎকণ্ঠা ও বিহ্বলতা দ্বারা অস্পষ্ট, তাই তার রূপায়নও অস্বচ্ছ, নীহারিকা-কুয়াশা-সমাচ্ছন্ন। এ শুধু পাঠককে বিভ্রান্ত করে, রসপ্রাপ্তির শান্তস্বর্গে পৌঁছুয়ে দেয় না।

শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য,—'...বর্ণনার মধ্যে কোন স্থির ভাবকেন্দ্রিকতা নাই, আছে তথ্য ও আবেগের এক বিসদৃশ সংমিশ্রণ, অতিরিক্ত বস্তুসন্নিবেশ, অবান্তর মন্তব্য, ছেলেমানুষী বিস্ময় ও মাত্রাতিসারী উত্তেজনার এক প্রকার জগাখিচুড়ি। বঙ্গসুন্দরীতে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে নারীর শ্রেষ্ঠ গুণের বৈচিত্র বিকাশই কবির বিষয়। এখানেও তথ্যের বস্তুপ্রধান কাঠামোর মধ্যে নারী-আদর্শের ভাব প্রশস্তি একটি সঙ্গতিহীন বিরুদ্ধ-উপাদান-গঠিত বাতাবরণ সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা আখ্যানকাব্য ও গীতিকাব্যের মধ্যে অনিশ্চিতভাবে আন্দোলিত হইয়াছে'। (বাংলা সাহিত্য বিকাশের ধারা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৪, ৩য় সং)

দ্বিতীয়ত, কবির লক্ষ্য অলৌকিক ও মিষ্টিক সৌন্দর্যের তীর্থে উত্তরণ। সীমার মধ্য দিয়েই তাকে ধারণ করতে হয়, একথা সত্য, কিন্তু অতি স্থূল, crude (অশোধিত) লৌকিক image এই অলৌকিক ভাব-পরিণতিতে পৌঁছোনোর পথে অধিকাংশ সময়ই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কবি চেতনায় পরিশ্রুত হয়ে লৌকিক বক্তব্য অলৌকিক ভাবনির্যাসে পরিণত হয়। কিন্তু বিহারীলাল তা পারেননি। তাঁর অশোধিত লৌকিক চিত্রগুলি ও তার প্রকাশভঙ্গি ভাবের সূক্ষ্মতা সম্পাদনে ও কাব্যের রসনিষ্পত্তিতে বাধাস্বরূপ হয়েছে। যথা,—

তৃষ্ণায় ফাটিছে ছাতি,
জল খুঁজে পাতি পাতি
বেড়ায় মহিষযূথ চারিদিক ফিরে।
এলায়ে পড়েছে গা,
লটপট করে পা,
ধুঁকিয়ে হরিণগুলি চলে ধীরে ধীরে। (সা. ম., ৫/২)

বা,

নন্দিনীর তাম্র গায়
চেটে চেটে চুমো খায়
মানুষের মত আহা চুমো খেতে জানে না (সা. আ, ৫/৮)

সূক্ষ্ম সৌন্দর্য ব্যঞ্জনার মধ্যদিয়েই প্রকাশ লাভ করে। কিন্তু ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে কিছু প্রকাশে বিহারীলাল অধিকাংশ সময় ব্যর্থ। সার্থক গীতি-কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য তার সাঙ্কেতিকতা। সঙ্কেতের বিন্দুর মধ্য দিয়ে সেখানে ভাবের সিন্ধু ব্যক্ত। কিন্তু সঙ্কেত সৃষ্টিতে বিহারীলাল অক্ষম।

গীতি কবিতার উপযুক্ত ভাষার ব্যঞ্জনা বিহারীলালে অনুপস্থিত। পরিবর্তে তাঁর ভাষা স্থূল, বহু সময়ে গ্রাম্যতার প্রান্তস্পর্শী। তার ফলে বক্তব্যের মন্ময়তা স্থূল চিন্তাবলেপে আচ্ছাদিত। যথা.

হয়ে তোর ভেড়া ভেকা
বৃথাই বাঁচিয়া থাকা। (সা. আ. ৭/২৬)

বা,

তুমি না ছেলেদের ঘুমের বেলায়
'ঘুমপাড়ানী মাসি পিসী' গাও কানে কানে
বুলাও ফুফু'রে হাত গুড়গুড়িয়ে গায়?
তাতেই তাদের চোখে ঘুম ডেকে আনে। (নিসর্গসন্দর্শন ৫/১৩)

বা,

কালের করাল হাসি
দশকে দামিনী রাশি,
কক্কড়্ দন্তে দন্তে ভীষণ ঘর্ষণ। (সা· ম· ৪/৬)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিগুলিতে 'ভেড়া ভেকা', 'ফুফু'রে হাত' এবং 'কক্কড়্' শব্দগুলি গীতিকাব্যিক রোমান্টিক ভাব কল্পনাকে খেলো করে দিয়েছে। অবশ্য গীতিকবি নিশ্চই মহাকাব্যের ভাবগম্ভীর সমুন্নত ভাষা ব্যবহার করবেন, এমন কথা কেউ বলবেন না। কারণ মহাকাব্যের অপরিচিত শব্দবহুল ভাষা গীতিকবির ভাবের আন্তরিকতাকে অভিব্যক্ত করতে পারে না। লিরিক কবির ভাষা হবে ব্যঞ্জনাবহ, আন্তরিক, সূক্ষ্মরুচি এবং ধ্বনিময়। লৌকিক ভাষাই মার্জিত হ'য়ে গীতি কাব্যের ভাষা হতে পারে, কিন্তু রূপ-পরিচ্ছন্নতায়, উপমা-অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্যে একটি অসীম-অনির্দেশ্য ব্যঞ্জনা ফুটিযে তোলাই, একটি অলৌকিক সৌন্দর্যানুভূতি ফুটিয়ে তোলাই এই ভাষার লক্ষ্য। কিন্তু বিহারীলাল সেক্ষেত্রে সাধারণভাবে অসার্থক। ভাষার উপর যতটা দখল ও অধিকার থাকলে 'প্রয়োজনের বাহক শব্দকে নমনীয় করে রহস্যময় নিখিলের বেদনাকে স্পর্শ করা যায় তা বিহারীলালের ছিল না। ভাবের ক্রম তাঁর রচনায় প্রায়ই রক্ষিত হয়নি, চিত্রের সূত্র বারবার হয়েছে ছিন্ন।' (ক্ষেত্র গুপ্ত)

সামগ্রিকভাবে ভাবকে সার্থক শিল্প আঙ্গিকের মধ্যে ধারণে কবি ব্যর্থ হলেও বিচ্ছিন্নভাবে মাঝে মাঝে কবির কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। যেখানে কবি তাঁর আন্তর অনুভূতিকে অনাবৃতভাবে প্রকাশ করেছেন, অথচ ভাষার স্থূলত্বকে পরিহার করতে সমর্থ হয়েছেন, সেখানে তাঁর কাব্য অপূর্ব সুন্দর হয়ে উঠেছে। আবার যখন লৌকিক কিন্তু শোধিত ভাষার মধ্য দিয়ে নিজের জীবনের কোন স্মৃতি-বেদনাকে চিত্রায়িত করেছেন, সেখানেও বহুক্ষেত্রে তাঁর কাব্যাংশ তুলনা-রহিত। তাঁর কবিজীবনের প্রাথমিক বস্তুতান্ত্রিকতার স্থূলত্ব পরবর্তী ভাবোচ্ছ্বাসের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং অস্পষ্ট। কিন্তু আরও পরে তাইই আবার সার্থক কবি কল্পনার দ্বারা পরিস্রুত—এমন উদাহরণও অবশ্য তাঁর কাব্যে আছে।

তাঁর যতটুকু সার্থকতা, তা তাঁর ভাবের আন্তরিকতার (Sincerity) জন্য। যেখানেই তাঁর ভাব আন্তরিক এবং সার্থক উপলব্ধিতে বিধৃত, সেখানেই তার

বাণীরূপও প্রকৃত কাব্য পরিচয়বাহী। এমনতর কিছু সার্থক কাব্যাংশের উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো।

(১) শ্যামল বরণ, বিমল আকাশ,
হৃদয় তোমার অমরাবতী ;
নয়নে কমলা করেন নিবাস,
আননে কোমলা ভারতী সতী।

সদানন্দময়ী আনন্দরূপিণী
স্বরগের জ্যোতি মূরতিমতী,
মানস-সরস-নীল-মৃণালিনী !
কে তুমি অন্তরে বিরাজ সতী ? (বঙ্গ সুন্দরী, ৩/১৩, ৪৪)

(২) সেই আমি, সেই তুমি,
সেই এ স্বরগ-ভূমি,
সেই সব কল্পতরু, সেই কুঞ্জবন ;
সেই প্রেম, সেই স্নেহ
সেই প্রাণ, সেই দেহ,—
কেন মন্দাকিনী-তীরে দুপারে দুজন ! (সা. ম. ৩/৩)

তবে কি সকলি ভুল ?
নাই কি প্রেমের মূল ?—
বিচিত্র গগন-ফুল কল্পনা লতার ?
মন কেন রসে ভাসে—
প্রাণ কেন ভালবাসে
আদরে পরিতে গলে এই ফুল-হার ? (ঐ ৩/২০)

(৩) প্রাণের ভিতর থেকে কে যেন আমারে ডাকে ;
ভুলিবার নয়, তবু ভুলে যেন গেছি কা'কে !
মনে পড়ে—ছেলেবেলা,
যার কাছে করি খেলা ;
মা আমার মুখপানে কতই স্নেহেতে চায়—
শিয়রে করুণাময়ী কার এ মূরতি ভায় ? (সা. আ, ২/নিশীথে/২)

(৪) সহর্ষ কেতকী-কুঞ্জ,
প্রফুল্ল চম্পক পুঞ্জ
সোনার কদম্ব সব রসে রোমাঞ্চিত-কায় ;
উল্লাসে মাঠের কোলে
তৃণের তরঙ্গ দোলে,
কাশের চামরগুশি সোহাগে গড়িয়ে যায় !
(সা. আ. ৩/প্রভাত/৪)

[ছয়]

প্রথম গীতি-কবি হিসেবে কবির দাবী

বিহারীলালের সার্থকতা প্রকৃত গীতি কবিতা রচনায় নয়, তাঁর মূল্য বাংলা সাহিত্যে অবিমিশ্র ও বিশুদ্ধ গীতি-ভাব প্রবর্তনে ও পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে ব্যাপক-গভীর প্রভাব সৃষ্টিতে। বাংলা সাহিত্যের অবিমিশ্র গীতি-চেতনার তিনিই উৎসমুখ। প্রাক্ বিহারীলাল বাংলা কাব্যে যে গীতিচেতনা ছিল না, তা নয়। চর্যাপদ, বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতি অবশ্য গীতি-চেতনার পরিচয় নিয়েই বাংলা সাহিত্য-প্রাঙ্গণে আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু চর্যাপদের মুখ্য চেতনা ধর্মীয়, এবং বৈষ্ণব পদাবলীর গীতি-চেতনা মাধ্যম-নিরপেক্ষ অনন্য সাপেক্ষিত নয়। বৈষ্ণব পদাবলীতে কবির মন্ময় ভাবনা রাধা-কৃষ্ণের উক্তির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে প্রকাশিত, সরাসরি কবি-মন থেকে পাঠক মনে সঞ্চারিত নয়। প্রকৃত গীতি-কবিতার প্রথম প্রকাশ রামপ্রসাদের শাক্তপদাবলীতে এবং কবিওয়ালাদের বিভিন্ন কবিগানে। কিন্তু রামপ্রসাদের গীতি-চেতনা একটি বিশেষ সীমায়ত্তির বাইরে সঞ্চারিত হয়নি। সন্তানের অভিমান ও মাতা-পিতার বেদনাবোধের মধ্যেই তার পরিসমাপ্তি। গীতি-ভাবনার মধ্যে আমরা বিশেষভাবে আশা করি রোমান্টিক চেতনা মিশ্রিত নরনারীর আকর্ষণ-বিকর্ষণ, বেদনা-বিরহ মিশ্রিত আকাঙ্ক্ষার মন্ময় আত্মপ্রকাশ। রামপ্রসাদে তার পরিচয় নেই। বরঞ্চ এই পরিচয় রয়েছে কবিওয়ালাদের সঙ্গীতের মধ্যে। ব্যক্তিক আকাঙ্ক্ষার অনাবৃত প্রকাশ, মাধ্যম-নিরপেক্ষ বক্তব্যের সরাসরি আবেদন, নরনারীর আদিম আকর্ষণের রোমান্টিক পরিবেশন,—এর সব

কিছুরই পরিচয়, অবশ্য ক্ষীণশক্তি, কবিগানে আছে। তাই তাঁদের গীতি কবিতার প্রথম স্রষ্টা বলা যায়।

কিন্তু তবুও বিহারীলালকে বাংলা গীতি-কবিতার উৎসমুখ বলা নিরর্থক নয়। কারণ বিহারীলালে কবিওয়ালাদের উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি তো ছিলই, তাছাড়া আধুনিক গীতিকবিতায় অন্যতম যে বৈশিষ্ট্যকে আমরা অনন্ত বলে মনে করি,—সীমার মধ্য দিয়ে অসীমের ব্যঞ্জনা-সঞ্চার, বস্তুর মধ্য দিয়ে বস্তু-অতীত সৌন্দর্যের উপলব্ধি—তা বিহারীলালের আগে আর কারো মধ্যে দেখা দেয়নি। প্রকাশের সুষ্ঠুতার দিক দিয়ে মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' ও 'বঙ্গভাষার প্রতি' অনেক বেশী সার্থক, কিন্তু উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য সেখানে অনুপস্থিত। আর উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য ধারণ করেন বলেই বাংলা গীতি কাব্যের উৎসমুখরূপে আমরা তাঁকে স্বীকার করি।

বিহারীলাল সমকালীন বাংলা কাব্যের কোন ধারারই অনুসরণ করেননি। নিজের মানস-চেতনার গভীরে ডুব দিয়ে অনন্যনিরপেক্ষ আপন ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলিকে অসঙ্কোচে, অনাবৃতভাবে ও নির্বিচারে উপস্থিত করেছেন। এর ফলে তাঁর কাব্য বহু সময়ই 'aloud thinking'-এ পরিণত হয়েছে। কিন্তু বাংলা কাব্যের পরবর্তী ধারা এর মধ্যেই আপন রস-উৎস খুঁজে পেয়েছে। সমকালীন বহু কবি যখন মধুসূদনের অনুসরণে কৃত্রিম ক্লাসিক কাব্যের ব্যর্থ অনুকরণকে জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন, তখন আপনমনের গভীরে ডুব দিয়ে বিহারীলাল অস্বচ্ছ কিন্তু অকৃত্রিম ব্যক্তিগত উপলব্ধিগুলিকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছিলেন। চেষ্টা করছিলেন সুন্দর বস্তুর কেন্দ্রীয় সৌন্দর্য-তত্ত্বটি আবিষ্কারের, সীমার মধ্য দিয়ে অসীমে পদসঞ্চার এবং অসীমের অনুভূতিকে সীমার মধ্যে উপলব্ধির। অলৌকিক সৌন্দর্যকে তিনি উপলব্ধি করতে চেয়েছেন বটে, এবং তা বস্তুহীন আকাশ-কুসুম কল্পনার মধ্য দিয়ে নয়, পরিচিত বস্তুসীমার মধ্য দিয়েই। কিন্তু কৃত্রিম ক্লাসিক ধর্মের pragmatic বস্তু চেতনা এ নয়। pragmatic বস্তু চেতনা বস্তুতেই বদ্ধ। বিহারীলাল বস্তুকে গ্রহণ করেছেন কিন্তু সৌন্দর্যের সোপানরূপে। বস্তুর অন্তরালস্থিত সৌন্দর্যই তাঁর লক্ষ্য। বস্তুসীমার সিঁড়ি বেয়ে অলৌকিক সেই সৌন্দর্য-লোকে উত্তরণই তাঁর কবি ধর্মের বৈশিষ্ট্য। বাঙালী তথা ভারতীয় চেতনার পক্ষে এই বৈশিষ্ট্য অভিনব। আধুনিক গীতি-ভাবনা এই চেতনাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত।

তাই আধুনিক গীতিকবিতার প্রথম অগ্রনায়কের সম্মান তাঁকে দেওয়া যেতে পারে।

এ-বিষয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা অনপেক্ষিত নয়। গীতিকবির প্রথম কাজ নিজের ভাব-চিন্তা-চেতনাকে অনন্যনিরপেক্ষভাবে পাঠকের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া। বিহারীলাল তা করেছেন। দ্বিতীয়ত, বাইরের বিভাব ও অপরের অনুভাবকে তিনি পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করতে পারেন বটে, কিন্তু তার আগে তাকে আপন রসস্বরূপে পরিণত করা দরকার। বিহারীলাল সে-বিষয়েও অসার্থক নন। কিন্তু তাঁর গীতিকাব্য-ধর্মের সার্থকতম পরিচয়, তিনি বস্তুর অন্তরালস্থিত তার আন্তর সত্তা, তার spirit-টুকুকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। মধুসূদন-অনুসারী কবিসমাজ যখন কেবল পুচ্ছগ্রাহিতা করে বস্তু-জগতের pragmatic চিত্রায়ণ ও শব্দ-ঝঙ্কার সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, বিহারীলাল তখন বস্তুর আন্তর ধর্মকে খুঁজছেন ও তাকে প্রকাশ করবার জন্য যে-কোন শব্দকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছেন। কেবলমাত্র বস্তুর যথাস্থিত (pragmatic) রূপের উপর যে-সাহিত্য রচিত হয়, তার নাট্য-ধর্ম, ঔপন্যাসিক বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি হয়তো অতুলনীয় হতে পারে, কিন্তু গীতিকাব্যধর্মে সে ক্ষীণশক্তি হতে বাধ্য। প্রকৃত গীতি-রসের উদ্বোধন হয়, বস্তুর তথ্য-রূপকে বিগলিত করে, তার সত্য-স্বরূপ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্য-স্বরূপের উদ্ঘাটনে। এই সৌন্দর্য-স্বরূপের উদ্ঘাটনেই উপলব্ধি করা যায়, পৃথিবীর সবকিছু একটি কেন্দ্রীয় রস-ঐক্যে বিধৃত। এই কেন্দ্রীয় রস-ঐক্যের আবিষ্কার, প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা আধুনিক গীতিকবিতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এই কেন্দ্রীয় ঐক্যের আবিষ্কারের জন্যও বাংলা গীতিকাব্য-ধারায় তাঁকে পুরোধার আসনটি দেওয়া সঙ্গত বলে মনে করি। বিহারীলাল আবিষ্কার করেছেন একটি কেন্দ্রীয় সৌন্দর্য-সর্বৈকসত্তা বিশ্বের সকল বস্তুরূপ ও ব্যক্তিরূপের মধ্য দিয়ে প্রতিবিম্বিত হয়ে প্রকাশিত। তাই বস্তু আমাদের আনন্দবিধায়ক, ব্যক্তি আমাদের প্রিয়তম। কবি এই কেন্দ্রীয় রস-সত্যের নাম দিয়েছেন সারদা।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের জন্যই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সুচিহ্নিত গীতিকবিরূপে তাঁকে স্বীকৃতি দেওয়া অসঙ্গত নয়।

কিন্তু আরও একটি কারণে ইতিহাসের বিচারে বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রতিষ্ঠা। বিহারীলাল-উত্তর বাংলা সাহিত্যে যে বিশিষ্ট গীতিপ্রবণতার ব্যাপক সম্প্রসার তার মূলে বিহারীলালের প্রভাব। তাঁর ভাব, বিশিষ্ট বক্তব্য ও কেন্দ্রীয় প্রত্যয়কে উপজীব্য করেই পরবর্তী বাংলা গীতিকবিদের আবির্ভাব, যদিও আঙ্গিক ও প্রকাশক্ষমতার দিক দিয়ে পূর্বসূরীকে তাঁরা বহুলাংশে অতিক্রম করে গিয়েছেন। আশ্চর্য মনে হয়, কবি-শক্তির দিক দিয়ে মধুসূদন বিহারীলাল অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেয়, অথচ তাঁকে অনুসরণ বা অনুকরণ করে যে-কবিকুলের আবির্ভাব, তাঁদের প্রভাব থেকে বাংলাসাহিত্যকে মুক্তি দিয়ে বিহারীলাল-প্রদর্শিত গীতিচেতনার মধ্যে বাংলাসাহিত্যকে প্রতিষ্ঠা দিলেন বিহারীলালের পন্থানুসারী কবিবৃন্দ। অতুলনীয় কাব্যিক প্রতিভার অধিকারী মধুসূদনের মহাকাব্যধারা বাংলাসাহিত্য প্রাঙ্গণ থেকে প্রায় লুপ্ত, আর বিহারীলালের গীতিকাব্যের শীর্ণ ধারার সার্থকতা রবীন্দ্র গীতিসমুদ্রের প্রেরণা সৃষ্টিতে।

বিহারীলালকে অনুসরণ করে পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে যে কবিদের আবির্ভাব তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই অতি শক্তিধর শিষ্যবর্গের সৃষ্টি ও তাঁদের মধ্য দিয়ে বিশিষ্ট গীতিকাব্যধারাটির সর্বাত্মক প্রতিষ্ঠাই ইতিহাসের বিচারে বাংলা সাহিত্যে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান।

বিহারীলালের মানস-ভাবনাকে স্বী-কৃত (assimilate) করে বাংলা সাহিত্য প্রাঙ্গণে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের আত্মপ্রকাশ। কিন্তু বিহারীলালের ভাবালুতা ও উচ্ছ্বাস-সর্বস্বতাকে সংযত সংহত অবয়বের মধ্যে বিধৃত করেছেন সুরেন্দ্রনাথ। বিহারীলাল যেখানে উচ্ছ্বসিত আকুলিত বিস্রস্ত, সুরেন্দ্রনাথ সেখানে দৃঢ়পিনদ্ধ শান্ত-আবেগ মিতভাষী। বিহারীলালের ভাবচেতনাকে অধিকতর সার্থক আঙ্গিকের মধ্যে প্রকাশ করেছেন তিনি।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের পরে বিহারীলালের কাব্যভাবের দ্বিতীয় অনুসরণকারী দেবেন্দ্রনাথ সেন। সুরেন্দ্রনাথের অতিপিনদ্ধ আঙ্গিক চেতনা কখনও কখনও স্বত প্রকাশিত মানস-বাসনার বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাষার অতি উচ্ছ্বাসে বিহারীলাল যেমন বহু সময় বাষ্প-সর্বস্ব নীহারিকা-মেদুর, তাকে এড়াতে গিয়ে ভাষার অতি কঠোর বিন্যাসের জন্য সুরেন্দ্রনাথ তেমন অধিকাংশ সময় হৃদয়ভাবের অনাবৃত প্রকাশে অতিকুণ্ঠ। এই দুই ত্রুটিকে সুমিত সামঞ্জস্যে

সংশোধিত করে সার্থক গীতি কবিতা রচনার চেষ্টা করেছেন দেবেন্দ্রনাথ সেন। তাঁর কবিতার মধ্যে যেন বিহারীলালের কবিস্বভাবের সার্থকতর ও পরিণততর বিবর্তন। তাঁর কবিতায় ব্যক্তিমানসের স্বচ্ছ দ্বিধাহীন প্রকাশ, কিন্তু তা বিহারীলালের মত উচ্ছ্বাসসর্বস্ব ভাবালুতায়, বা সুরেন্দ্রনাথের মত অতিপিনদ্ধ প্রকাশ-কুণ্ঠায় বিপর্যস্ত নয়, পক্ষান্তরে সরল অথচ মিত প্রকাশভঙ্গিমায় সার্থক।

গীতি কবি অক্ষয়কুমার বড়াল সোচ্চারভাবে বিহারীলালকে গুরু বলে স্বীকার করেছেন। বাংলা গীতিকবি হিসেবে অক্ষয়কুমারের সার্থকতা অবিসংবাদিত। বিহারীলালের মতই ইনি কখনও রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষায় আকুল, লিরিক উৎকণ্ঠায় তীব্র, কোথাও বা গভীর বিষণ্ণতায় উদাস। একদিকে বিশ্বাভিসারী কল্পনা ও অপরদিকে নির্জন গৃহের নিভৃত শান্তির অনুসন্ধান,—এঁকে বিহারীলালের সার্থক উত্তরসূরিত্ব দান করেছে।

কিন্তু বিহারীলালের সুরের শ্রেষ্ঠ গীতিকার কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ। বিহারীলালের গীতিরসধারার সঙ্কীর্ণ স্রোতকে তিনি বিপুলবিস্তৃতি ও অতলান্ত গভীরতা দান করলেন। লোকালয়ের জলতরঙ্গ-ধ্বনির পরিবর্তে সেখানে মহাসমুদ্রের কলোচ্ছ্বাস শোনা গেল। বিহারীলালে রূপ ও অরূপের দ্বন্দ্ব, সীমা-অসীমের মিলন-প্রচেষ্টা, খণ্ডের মধ্য দিয়ে অখণ্ডের অভিব্যক্তি,—রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের কাব্যকৃতির মধ্য দিয়েও তারই সাধনা। ভাব ও আঙ্গিক, উভয় দিক দিয়ে বিহারীলালের গীতিকাব্য-চেতনাকে আত্মসাৎ করে রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ অবশ্য অনেক অনেক বেশী বিবর্ধিত ও বিবর্তিত রূপে। এই শিষ্য সম্প্রদায়ের কাব্য-সাধনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে বিহারীলালের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং অন্যতম এই কারণের জন্যই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম গীতিকবিরূপে তাঁর মর্যাদার স্থান অনস্বীকার্য।

অ-দুঃখবাদী কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

[এক]

পূর্বপক্ষ

বাঙ্‌লা কাব্য-পাঠকমহলে এই ধারণা বিশেষভাবে প্রচলিত যে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত দুঃখবাদী কবি ছিলেন এবং তাঁর এই দুঃখবাদ সমকালীন একদল রবীন্দ্রানুসারীর অতি রোমান্টিক কাব্য-পেলবতার প্রতিক্রিয়ায়। বক্তব্য দুটি দ্বিতীয়বার পরীক্ষা-সাপেক্ষিত।

অবশ্য আপাত-বিচারে যতীন্দ্রকাব্যে এই দুঃখবাদের পরিচয় হয়তো স্বীকার না-করে উপায় থাকে না। শ্যামল-পেলব বাংলা দেশের রসাদ্র চিত্তভূমির কাছে যতীন্দ্রকাব্যের মরুভূমিসুলভ দাহ প্রাকপরিচয়বিহীন। বাংলাকাব্যে সম্ভবত আমরা প্রথম এমন এক কবিকে পেলাম যাঁর কাব্যের বহিরঙ্গন ব্যাপ্ত করে কেবল রিক্ততার জয়গান, বেদনার সুরস্পর্শ। অধিকাংশের মতে তাঁর কাব্যের অন্তরঙ্গেও এই বেদনা-রিক্ততা-ব্যর্থতা-হতাশা। সমস্ত চেতনাকে অতিক্রম করে তাঁর সমগ্র কবিতায় মহাজড়ত্ব তার পরমস্পর্শ সঞ্চারিত করে দিয়েছে বলে এঁরা মনে করেন।

এঁদের মতে সৌন্দর্য-মাধুর্য-বিশ্বাস-সুখ-নির্ভর কবিমনের যে কম্পমান ভাবাবেগ বা দীপ্ত মনন কাব্যের মধ্য দিয়ে স্বতপ্রকাশিত হয়ে ওঠে, যতীন্দ্র-কাব্যে তার পরিপূর্ণ ব্যত্যয়। সেখানে ভাবাবেগ বা মনন-দীপ্তির কোন অভাব ছিল না। কিন্তু সেই ভাবাবেগ বা মনন দুঃখ যন্ত্রণা ও হতাশাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। সংশয় অবিশ্বাস বেদনা অতৃপ্তি তাঁর কবিমানসের বাসনা-লোকে এক রৌদ্রতপ্ত দাহ সৃষ্টি করে তাঁকে করে তুলেছে দুঃখবাদের কবি। বাঙ্‌লা কাব্যপাঠক-সাধারণের কাছে তাই তিনি দুঃখবাদের কবি বলেই পরিচিত।

এই দুঃখবাদের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁরা মনে করেছেন, কবি যতীন্দ্রনাথের মতে, বিশ্বাস বা সুখ নয়, দুঃখের বহ্নিজ্বালাই সকল সত্তার আদি আলয়, দুঃখ থেকেই বিশ্বের এবং বিশ্ববাসী সকল জীবের আগমন বা উদ্ভব। দুঃখের দাবদাহের মধ্যেই জীবন যাপন করতে হবে। জীবনের সমাপ্তিতে নিখিল শূন্য ব্যাপ্ত করে থাকবে এক রুদ্র দেবতার অন্তহীন দুঃসহ বহ্নিজ্বালা।

শ্রদ্ধেয় ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয়ের মতে, 'মানবজীবনের এই যে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখদাহন—কবির দৃষ্টিতে ইহার তিলমাত্রও আগন্তুক নহে, ইহা মায়াচ্ছন্ন জীবের ভ্রমজনিত কর্মভোগও নয়—ইহাই ব্যক্তি জীবনের স্বরূপ, ইহাই বিশ্বজীবনেরও স্বরূপ' (কবি যতীন্দ্রনাথও আধুনিক বাঙলা কবিতার প্রথম পর্যায়, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৬)। নিরবধি কাল ও বিপুল বিশ্ব বিধৃত করে জগতের অধিদেবতা দুঃখের তপস্যারত।

সমগ্র জীবন সম্পর্কে কবির এই দুঃখবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মরীচিকা' থেকেই। এই গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'বহ্নিস্তুতি'তেই তিনি 'তপনতপ্ত', 'চির-অতৃপ্ত', 'বৈশ্বানর'কে প্রণাম জানিয়ে তাঁর কাব্য সুরু করেছেন। মানবের প্রতিনিধিরূপে নিজেকে তাঁর মনে হয়েছে শমীবৃক্ষ, শেষ পরিণতিতে দগ্ধাবশেষ ভস্ম হওয়াই যার ললাটলিপি।

তপন-তপ্ত, চির-অতৃপ্ত, অনন্তরূপ বহ্নি !
শিবললাটিকা, প্রলয়াগ্নিকা তুমি দীপশিখা তন্বী।
রক্ত বসন, ভস্মআসন, বিশ্বশাসন জ্যোতি,
কান্ত ভয়াল, আঁধারের আলো, তোমায় করি গো নতি।
শিখায় শিখায় হেরি তব রূপ, রূপে রূপে তব শিখা,
তৃষিত মরুর নীরস অধরে তুমি ধরো মরীচিকা।
নিখিল বিশ্বে খুঁজে ফিরি' তোমা যত পতঙ্গ সবে,
হে বৈশ্বানর, অবিনশ্বর, ভস্মে শান্তি লভে।
... ...
হে সর্বভুক, এ দীন শর্মার লক্ষ প্রণাম লহ,
কঠিন শীতল অন্তর তার আশিস্-দাহনে দহ।

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'মরুশিখা'তেও সেই একই দুঃখবাদের চেহারা। সেখানে কাব্যসূচনা থেকেই 'জীবনের' দীর্ঘ পথ পরিক্রমাকে এক অর্থহীন বিভ্রান্তিরূপে ঘোষণা,—

প্রভাতে হৃদয়-বনে ছুটে মায়ামৃগ,
দু'পরে বুকের মরুপারে মরীচিকা,
আঁখির 'জলা'য় সাঁঝে আলেয়ার খেলা
নিশীথে হারায় পথ প্রাণ-খদ্যোতিকা।
হায় কবি, কথা কেটে কোন ফল নেই,
'দুঃখ বল', 'সুখই বল', জীবন ত এই। (জীবন)

তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'মরুমায়া'তেও একই উপলব্ধির প্রকাশ। সেখানেও 'আলেয়া'-জীবনকে সত্য ভেবে কবি-দার্শনিক তার মধ্যে যে অলৌকিক জীবনানন্দ লাভ করেন তার প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ-কটাক্ষ কাব্যের প্রথম থেকেই,—

আপন জ্বালার চকিত আলোকে
অন্ধ জলার বুকে
অলীক আলেয়া ঘুরে মরি মোরা
অহেতুক কৌতুকে।
যারে পাই নাই তারে হারাইয়া
খুজে ফিরি দেশে দেশে,
যা কোথাও নাই তাই খুঁজে পাই
সহসা পথের শেষে।
অকূল অশ্রু-কালীদহে মোরা
ক্ষণিক কমল-ভ্রান্তি;
গহনসিক্ত বিষবাষ্পের
দাহনদীপ্ত শ্রান্তি।
মোরা—জ্ব'লে নিভি, নিভে জ্বলি গো।
পাগল হাওয়ার বন্ধুর স্রোতে
হাবুডুবু খেয়ে চলি গো! (আলেয়া)

এতদিন অন্যান্য কবিদের মায়াচ্ছন্ন দৃষ্টি যেখানে সৌন্দর্য-আনন্দ-সুখ দেখেছে, এই কবির বিচ্ছিন্ন-মোহ নয়ন সম্মুখে তাদের ভিন্নতর স্বরূপ উদ্ঘাটিত। আনন্দ নয় দুঃখই আমাদের পরম প্রাপ্তি। শরতের সকাল এই কবির মনের উপর কোন 'অরুণ আলোর অঞ্জলি' ছড়িয়ে দেয় না, ফাল্গুন রজনীতে বোমারু বিমান হঠাৎ হল্লা করে ও রজনীগন্ধা তার গন্ধবিতরণ বন্ধ রেখে 'শুভ্র ঝাণ্ডা' তুলে ধরে, মাহ ভাদরের ভরা বাদরে ivory tower-এ বসে তিনি মেঘদূত পড়বার সুযোগ পাননা,—তখন তাঁকে 'বাইকে' চড়ে কর্দমাক্ত পথে পথে ঝড়-ঝঞ্ঝা মাথায় করে দিনাতিপাত করতে হয়। অন্ধকারের পরপারস্থিত কোন আদিত্যবর্ণ আনন্দময় বিশ্বের অধিদেবতাকে তিনি উপলব্ধি করতে পারেন না, কেবল দিগন্তব্যাপী এক দুঃখের অন্ধকার তাঁর কাছে পরম সত্য বলে মনে হয়। বিশ্বব্যাপ্ত অতল দুঃখসিন্ধুতে কেবল সুখের দু-একটি তরঙ্গ ওঠে মাত্র,—সেই সুখের দু-একটি তরঙ্গ-সৌন্দর্যে মাতোয়ারা হয়ে তিনি তীরে বসে গান

গাইতে পারেন না, কারন 'দিগন্তপারে তরঙ্গ-আড়ে' তাঁকে হাবুডুবু খেতে হয়। তাই তিনি এই বিশ্বের সভাকবি হতে পারলেন না, তিনি হলেন 'দুঃখবাদী বৈরাগী'। (দ্রঃ ঘুমের ঘোরে/৭ম ঝোক/মরীচিকা, পথের চাকরী/ঐ, অন্ধকার/মরুশিখা, দুঃখবাদী/ঐ)

কবির প্রকৃতি-চেতনাতেও ঐ একই দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ। এবং ঈশ্বর বা বিধাতা সম্পর্কিত মনোভাবেও। কবি মাত্রেই প্রকৃতির পূজারী। কারণ কবিরা সৌন্দর্যের পূজারী এবং কবি-বিশ্বাসে প্রকৃতি সৌন্দর্য-মাধুর্যের প্রতিমূর্তি। প্রকৃতি সুন্দর কারণ প্রকৃতির মধ্য দিয়ে অনন্ত অভিব্যক্ত, যে অনন্তত্ব বস্তুদেহে অভিব্যক্ত হলে বস্তু সুন্দররূপে প্রতিভাত হয়, এবং ব্যক্তির মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হলে ব্যক্তি হয় প্রেমের আস্পদ। তাই প্রকৃতি একদিকে সৌন্দর্যের আলম্বন বিভাব এবং অন্যদিকে প্রেমের উদ্দীপন বিভাব। একদিকে সে মানুষের সৌন্দর্যবোধকে উদ্বোধিত করে ও তৃপ্তি দেয় এবং অন্যদিকে সে মানুষের প্রেমলীলাকে পরিপুষ্ট করে। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের মনোধর্মে এই চিন্তার বৈপরীত্য। তাঁর বিশ্বাস, প্রকৃতির ভিতর নিয়মশৃঙ্খলা বা শোভা-সৌন্দর্য আভ্যন্তরিক (latent) নয়, এ কেবল বহিঃপ্রলেপ, বাইরের ভান, মানুষকে ভুলিয়ে খেলানর 'টোপ' মাত্র। আমাদের কবি বুঝতে পেরেছেন,—

> সুনীল আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাস, বিমল নদীর জল,
> গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি, সুন্দর ধরাতল!
> ছবি ও ছন্দে তোমারি দালালি করিছে স্বভাব কবি,
> সমসুন্দর দেখে তারা গিরি সিন্ধু সাহারা গোবি।
> তেলে সিন্দূরে এ সৌন্দর্যে 'ভবি' ভুলিবার নয়;
> সুখ-দুন্দুভি ছাপায়ে বন্ধু ওঠে দুঃখেরি জয়। (দুঃখবাদী/মরুশিখা)

সমস্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে কবি এই দুঃখের রূপ দেখেছেন। যে শারদীয়া সৌন্দর্যে বাংলাদেশের শ্যামল অঙ্গ অমল শোভাতে ঝলকিত হতে থাকে, সেই শরৎকাল কবির কাছে বঙ্গদেশের 'খানা-ডোবা'-আকীর্ণ 'মলিন অঙ্গ'কেই প্রকাশ করে দেয়; যে-'বেণুবন' 'চ্ছায়াঘন সন্ধ্যায়' 'গোধূলির বাঁশরির 'সর্বশেষ সুর' সঞ্চারিত করে, বাঁশী হয়ে বাজবার জন্য 'গোটাকতক ছ্যাঁকায়' তাকে যে জ্বলতে হয়, তা কবির দৃষ্টি এড়ায় না। তরঙ্গ-গুনিত সমুদ্রতীরে এসে আমাদের কবি সমুদ্রের মিথ্যা সুখের গান রচনা করতে পারেন না, কারণ ক্রন্দনউত্থিত বিষ-জর্জ্জর সমুদ্রের বেদনাই তাঁর চোখে প্রধান হয়ে ধরা

পড়ে। শাঙন গগনের ঘোর ঘনঘটায় কোন অবলা কামিনীর অভিসার-গমন কবির চোখে পড়ে না, তিনি কেবল বর্ষার অশান্ত ঝর ঝর শব্দের মধ্যে শোনেন 'অন্ধ অনন্তের ক্রন্দন ছন্দের' বা 'শাবক-হারা বাঘিনী'র গর্জন। যখন 'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা' তখন কেউ তাঁর পারে 'গান গেয়ে তরী বেয়ে' আসে না, কেবল সেই 'শ্রাবণ-ধারা উপঝ'রণ'-রাত্রে তাঁর চোখে পড়ে 'পাঁচীর ছেলের শব পচে অকারণ!' এমনিভাবে প্রকৃতির সকল পত্রপুষ্প, আলোক-আকাশ, ঋতুসম্ভারের মধ্য দিযে কোন পরম সৌন্দর্য বা অনন্ত আনন্দ কবির কাছে ধরা পড়ে না, সকল কিছু আবৃত করে তাঁর চোখের উপর ভাসতে থাকে দুঃখের এক অখণ্ড অন্ধ পাথার। (দ্রঃ শরতে বঙ্গভূমি/মরুশিখা, বাঁশীর গল্প/ঐ, সিন্ধুতীরে/ঐ, শাওন রাত্তি/মরুমায়া, দুঃখের পার/ঐ)।

কবির ঐশ্বরিক উপলব্ধিও দুঃখবাদেরই পরিচয়বাহী। কবিরা এই বিশ্বের অধিদেবতার মধ্য দিয়ে এক অখণ্ড আনন্দের স্রোত প্রবাহিত দেখেন—তাঁর মধ্যেই সমস্ত খণ্ডিত আনন্দ সৌন্দর্য ও প্রেম পূর্ণতা লাভ করে। আমাদের আলোচ্য কবির কাছে কিন্তু তিনি মানবের এক অত্যাচারী প্রভু। মানুষের ঘাড় ধরে তার কাছ থেকে দাসত্ব আদায় করাতেই এই প্রভুর সুখ; তিনি এক নিষ্ঠুর কর্মকার, মানুষকে 'পুড়িয়ে পিটানো ছাড়া' তাঁর 'নাহিক কর্ম আর'। (দ্রঃ ভক্তির ভারে/মরুশিখা, লোহার ব্যথা/ঐ)

কবির উপলব্ধি, এই জগতের স্থিতি কোন কল্যাণময় চেতনশক্তিতে নয়, অন্ধ নিষ্ঠুর শৃঙ্খলাহীন এক জড়শক্তিতে এই জগৎ ওতপ্রোত। চেতনা যদি কোথাও থাকেও, তা এই অসীম জড়ের মধ্যেই আত্মনিমজ্জিত, সঙ্কুচিত, স্বপ্নের মতই তা অবাস্তব। তাই প্রেম, যাকে চেতনশক্তির সর্বোত্তম পরিচয় বলা যায়, তা কোথাও নেই, তা একটি অন্ধসংস্কার মাত্র। কবির উপলব্ধি—

প্রেম ব'লে কিছু নাই—
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।

(ঘুমের ঘোরে/প্রথম ঝোঁক/মরীচিকা)

চেতনসত্যে অবিশ্বাসী কবি অন্ধ জড় জগতে শুধু গোঁজামিল আর খামখেয়ালি ছাড়া অন্য কিছু দেখেন না। এই গোঁজামিলের ভার যত বাড়তে থাকে, ততই জীবনের চারিদিকে স্তূপীকৃত হতে থাকে দুঃখভার। এই মহাজড়ত্বময় বিশ্ব থেকে বাইরে যাওয়ার কোন পথ নেই। অজানা কোন বস্তু-অতীত আনন্দ

আমাদের জন্য শেষ সুখের দিন রচনা করছে না। এই নির্মম নিষ্ঠুর জড়বিশ্বের সর্ব প্রত্যন্ত দেশ ব্যাপ্ত করে পরম দুঃখের যন্ত্রণার ও পীড়নের এক অন্তহীন লীলা চলছে। এই পরম দুঃখের হাত থেকে যখন নিস্তার নেই-ই,—তখন কবি এই দুঃখ ভুলে থাকবার একটা উপায় বের করেছেন। তা হচ্ছে 'ঘুমিওপ্যাথি'। জেগে থেকে সচেতন মন নিয়ে চারিপাশে তাকালেই তো বিপদ, জীবনের বাস্তব পথে চললেই তো কণ্টকবিদ্ধ ক্ষতবিক্ষত চরণতলই শেষ নিয়তি। তা থেকে রেহাই পাওয়ার সহজ উপায় গভীর ঘুমের মধ্যে আত্মনিমজ্জন,—

শান্ত রাত্রি, জ্যোৎস্না শীতল, বনভূমি নিঝঝুম,
সেই পথ দিয়ে আমার চক্ষে আসুক গভীর ঘুম!
সেই জুড়াবার ঠাঁই;
কঠিন সৃষ্টি ধোঁয়া হয়ে আসে কোথা কিছু বাধা নাই।
(ঘুমের ঘোরে/প্রথম ঝোঁক/মরীচিকা)

মহাজড়ময় বিশ্বের অন্তহীন দুঃখ থেকে পালিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কবি জড়ত্বের কোলে আত্মসমর্পণকেই আত্মরক্ষার উপায় বলে স্থির করেছেন। এমনভাবে জীবনে ও জগতে দুঃখের উপলব্ধি ও বাংলা কাব্যে তার প্রকাশ যতীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায়নি।

[দুই]

উত্তরপক্ষ

যতীন্দ্রনাথকে দুঃখবাদী কবি বলে বাংলা সাহিত্যের যে সকল সমালোচক রায় দিয়েছেন, এতক্ষণ আমরা তাঁদের বক্তব্যের সারমর্ম উদ্ধারের চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমাদের বক্তব্য ভিন্নতর। যতীন্দ্রনাথ দুঃখবাদী,—এ যতীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দ্রুত পঠন ও দ্রুত মতপ্রকাশ (hurried reading & hurried opinion)-এর ফল। যতীন্দ্র-কাব্যের গভীরে প্রবেশ করলে ভিন্নতর সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ে।

প্রথমত, '-বাদ' শব্দটির ভিতর দিয়ে যে দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক প্রত্যয় প্রকাশিত, কেউ যখন সেই প্রত্যয়ে পৌঁছোন, তখন সেই প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে তাঁর কোন প্রতিবাদ থাকে না। জীবন ও জগতের পরম সত্য বলেই তাকে তখন

তিনি স্বীকৃতি জানান। 'মাধ্যাকর্ষণ শক্তি' একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। যিনি এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে অবহিত তিনি কি তেলের শিশি মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল বলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে বসেন? তিনি জানেন এ প্রতিবাদ অর্থহীন। তেলের শিশি ভাঙলো বলে তিনি বেদনা পেতে পারেন, কিন্তু শিশুমনস্ক না হলে তিনি মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে অর্থহীন প্রতিবাদের অংশীদার হতে পারেন না। 'জগৎ এবং জগতস্থ সবকিছু গতিময়' এই দার্শনিক প্রত্যয় যাঁর হয়েছে, যৌবন শেষে প্রৌঢ়ত্ব এবং বার্ধক্যের আগমনে তাঁর দুঃখ থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে কি তিনি ঐ নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বসেন! সত্য যেখানে উপলব্ধীকৃত ও প্রত্যয়ে পরিণত সেখানেই তাকে কোন '-বাদ' নামে অভিহিত করা যায়। অন্যথায় নয়।

এবং যেখানে কোন স্বত প্রকাশিত ব্যাপারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা প্রতিবাদ, সেখানে সেই ব্যাপারটির চিরন্তনত্ব সম্পর্কে ভিতরে ভিতরে অবিশ্বাস আছে বলেই তো প্রতিবাদের প্রচেষ্টা; এবং তার জন্যেই তো বিদ্রোহ অর্থবহ। যতীন্দ্রনাথ যদি দুঃখবাদী কবিই হবেন, দুঃখ যদি তাঁর দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়েই পরিণতই হবে, তবে তো তিনি নৈর্ব্যক্তিক এই জগৎ-সত্যকে স্বীকারই করে নেবেন, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ করতে যাবেন কেন। এবং তখনই তো তাঁকে বলা যাবে দুঃখবাদী কবি।

কিন্তু যতীন্দ্রনাথ কখনই তা করেন নি। তিনি জগতোত্থিত দুঃখকে উপলব্ধি করেছেন, এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর কাব্যে প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য বিদ্রোহ এই দুঃখেরই বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহ থেকেই বোঝা যায়, তিনি বিশ্বাস করেন জগতের মূল সত্য সুখ ও মানুষের পরম প্রাপ্তব্য আনন্দ; কিন্তু কোন জটিল ও কুটিল আপাত-প্রক্ষিপ্ত শয়তানি ও জড়ত্ব এই সুখ ও আনন্দের পথ রুদ্ধ করে রেখেছে। এই বাধার জন্যই কবির বেদনা, এই দুঃখের বাধাকে অতিক্রম করা যাচ্ছে না বলেই কবির যন্ত্রণা এবং যারা এই দুঃখের বাধা ও আপাত-শয়তানির যবনিকাটিকেও অস্বীকার করতে চাইছে তাদের প্রতি ব্যঙ্গ-কটাক্ষ। বিশ্বের অভ্যন্তরস্থ পরমানন্দে বিশ্বাস না থাকলে, দুঃখ এবং দুঃখের কারণকে এত তীব্র ব্যঙ্গে বিদ্ধ করা যায় না। এবং সেই পরমানন্দে যাঁর বিশ্বাস আছে তাঁকে কি দুঃখবাদী কবি বলা যায়?

দ্বিতীয়ত, যে বলিষ্ঠ জীবনাবেগের মধ্য দিয়ে তাঁর কাব্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রবাহিত, তা কি কোন দুঃখবাদী কবির কাব্যে সম্ভব? তাঁর কাব্যের

আঙ্গিক-বলিষ্ঠতা, ভাবের গভীরতাও প্রকাশের প্রবলতা মুহূর্তের মধ্যে আমাদের মর্মকে স্পর্শ করে ; তার কারণ জীবনের প্রতি গভীর ভালবাসা ও তার অন্তরালস্থিত সুস্থ জীবন সম্পর্কে গভীর প্রত্যয় তাতে সঞ্চারিত। প্রকৃত দুঃখবাদী কবির কাব্য জীবন-প্রত্যয়ে হীন, তাই ক্ষীণশক্তি, আবেগবিমুখ। কিন্তু এই কবির কাব্যে কি প্রচণ্ড আবেগই না জীবন-রসের পরিচায়ক হয়ে দেখা দিয়েছে।

যতীন্দ্রনাথকে যাঁরা দুঃখবাদী কবি বলে মনে করেন, তাঁদের মতে সমকালীন রোমান্টিক কাব্য-পেলবতার অতি প্রাবল্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশের জন্য কবির লেখনী ধারণ। আর তার ফলে তাঁর কাব্যে 'ইঁট বেরকরা নটখটে পথে'র পরিচয়। কোমল শ্যামল স্নিগ্ধ মায়াচ্ছন্ন পুষ্পাস্তীর্ণ পথের পথিক তিনি নন। তাঁর কাব্যের প্রকৃতি-চিত্র ও ঈশ্বর-চিন্তায় তাই কোন সুন্দরের ও কল্যাণের আদর্শ নেই। তাঁর প্রকৃতি নির্মম নির্দয় রক্তচক্ষু এবং ঈশ্বর কঠিন কর্কশ অসুন্দর ও অত্যাচারী। চারিপাশে তাকিয়ে তিনি পেয়েছেন 'বাশি খালের একটা পচা গ্যাঁজলা গন্ধ ও বর্ণহীন বিস্বাদ'।

কিন্তু প্রকৃতই কি তাই ? যতীন্দ্রকাব্যের গভীরে রোমান্টিক আবেশ ও সৌন্দর্যসঞ্চারী পংক্তি কি কিছু কম আছে ? এমন কি তাঁর প্রথম তিনখানি কাব্য 'মরীচিকা'-'মরুশিখা'-'মরুমায়া'—যেখানে শুধু মরুভূমির ধু-ধু রিক্ততার বালু-মহোৎসব বলে সমালোচকগণ এবং কবি নিজেও মনে করেন, যেগুলিতে বলা হয় কবির দুঃখবাদী জীবনদর্শনের দৃঢ়ভিত্তিক প্রতিফলন, সেখানেও রোমান্সসিঞ্চিত, সৌন্দর্যস্পর্শী আনন্দব্যঞ্জিত পংক্তি কিছু কম নেই। আর যেখানে দুঃখ ও দগ্ধ জীবনবাণীর প্রকাশ, তারও অন্তরাল থেকে জীবনানন্দ ও সৌন্দর্যানুভূতি উঁকি দিচ্ছে। এমন কি যে ভাষায় তিনি আনন্দকে ব্যঙ্গ করেছেন, তাতেও কি আশ্চর্য আনন্দ ও রোমান্টিকতার স্পর্শ। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

> অঙ্গে আমার লেগেছে রে আজ
> নব নিদাঘের ঘোর ;
> ওরে মন, আয় সাঙ্গ করিয়া
> সকল কর্ম তোর !
> বিছায়ে নে মোর শিথিল শরীর
> শ্লথ আঁচলের প্রায় ;

চেয়ে থাক্ দূরে, অর্ধশয়নে
আধখোলা জানালায়।

দু'পর বেলার রূপালি রৌদ্রে
ফুলদল পড়ে নুয়ে,
মৌমাছিগুলি গুঞ্জন তুলি'
উড়ে যায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে ;
ফুলের গন্ধ ফুলেরে ঘেরিয়া
গুমট করিয়া আছে,
অমনি গান কি গন্ধের মতো
ঘুরে বেড়া মোর কাছে !

... ..

শীতল শিলায় শ্রান্তি বিছায়ে
শিথিল অঙ্গ রেখে,
নিমীল নয়নে মলিন বিরহ
মিলন-স্বপন দেখে !
সুদূর অতীত কাছে আসে আজ
কি গোপন সেতু বাহি' ;
অদেখা অগম দাঁড়ায়েছে যেন
মোর মুখপানে চাহি' !

এসেছে তাহারা দিগন্তহারা
সাহারা প্রান্ত হ'তে,
এসেছে রে তারা কোন বসোরার
খর্জুরবীথি পথে ;
কত বেদুয়ীন্ পার ক'রে মরু
দীপ্ত-অগ্নি-ঢালা,
নামায় আমার হৃদয়ের হাটে
তরুণী ইরানী বালা !

মর্মরে পাথা মর্মবেদীতে,
কে পাতি' পদ্মপাতা,
পত্রলেখায় লিখিতে অঙ্গ
ঘুমে ঢুলে' প'ড়ে মাথা !
আঁখি মুদে একা পড়ে আছি এই
সুখস্মৃতি ঘেরা নীড়ে,
প্রাণ ভ'রে যায় চেনা অচেনার
মিলন মধুর ভিড়ে ! (নবনিদাঘ/মরীচিকা)

যখন সচেতন কবি-চেতনায় বস্তুবিশ্বের দুঃখময়তার অক্ষয় প্রকাশ, তখনও কবির অবচেতন মনের রোমান্স-আবেগ অন্তঃশীলা নদীর মত আভাসে-ইঙ্গিতে কখনও বা যথেষ্ট প্রত্যক্ষতায় আত্মপ্রকাশ করেছে ভাষা-ছন্দ ও ভাবের মধ্য দিয়ে। কবি যখন বলেন, 'শান্ত রাত্রি, জ্যোৎস্নাশীতল, বনভূমি নিঝঝুম', (ঘুমের ঘোর/১ম ঝোঁক/মরীচিকা) তখন তার পরের পংক্তিগুলিতে অসহনীয় জড়বাদের দিকে যতই অঙ্গুলি নির্দেশ থাক না, উদ্ধৃত পংক্তিটি কবির অবচেতন মনের রোমান্টিক সৌন্দর্যস্পর্শকে প্রকাশ করে দেয় ; কবির কোন সচেষ্ট প্রয়াসও তাকে ঢাকতে পারে না। নবান্নের দিনে নষ্ট-ক্ষেতের বেদনার কথা গৃহে আগন্তুক অতিথিকে মনে করাতে গিয়ে ও নিজের দগ্ধভালকে কটাক্ষ করতে গিয়ে এমন একখানি প্রকৃতি-চিত্র উদাহরণ দেন, যা সৌন্দর্যে, স্বাভাবিকতায় ও সরলতায় সঙ্গে সঙ্গে মনকে অপূর্ব আনন্দরসে ভরে দেয়। কবির সচেতন বেদনা কোন অতলে পড়ে থাকে, তার সকল পত্র-বৃতিগুলিকে ঠেলে প্রকাশিত হয় প্রকৃতি-সৌন্দর্যের শতদল—

তার চেয়ে এস প্রভাত-আলোকে চেয়ে থাকি দূর-দূরে,—
বাঁকা নদী যেথা চরের কাঁকালে জড়ায় জরির ডুরে।
যেথায় আকাশে ভুলে নেমে আসে মানস-মরাল শ্রেণী,
যেথা দিক্‌বালা শীতের বেলায় এলায় আঁচল বেণী। (নবান্ন/মরুমায়া)

এ যেন শত্রু-ভাবে সাধনা। যাকে সচেতন ভাবে এড়াতে চান, ধিক্কার দিতে চান, তারই আশ্চর্য চিত্র রচনা করে কবি তাকেই কটাক্ষ করতে চান। অন্তরে প্রকৃতির প্রকৃত সৌন্দর্য-আনন্দানুভূতি না থাকলে কি, নিন্দা করবার জন্য, মায়া বলে উড়িয়ে দেওয়ার জন্যও এমন চিত্র-সৃষ্টি সম্ভব ?

অন্তর্লীন (latent) এই রোমান্টিক আবেগ ও সৌন্দর্যানুভূতিকে কবি তীব্র সচেতন প্রয়াসে চাপা দিতে চেয়েছেন, কিন্তু প্রস্তরভারের তলদেশ থেকে সুযোগ পেলেই একটি দুটি শ্যামল তৃণগুচ্ছ কোন ফাঁক-ফোকর দিয়ে আনন্দ-সূর্যালোকের দিকে নিজেদের শীর্ষ বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তার আরও পরিচয়—

(১) কথা কও, বউ কথা কও!
চিরবঞ্চিত বাঞ্ছিত এল—
দুয়ার খুলিয়া ডেকে লও।
ঘর কন্নার এতই কী কাজ,
সাঁঝের আঁধারে এত বা কী লাজ?
কত যতনের কবরীর সাজ
গুণ্ঠনে কেন ঢেকে রও?
কথা-ভরা প্রাণে অভিমান ঝাঁপি'
ব্যাকুলিত ব্যথা কেন সও—
বউ, কথা কও!

* *

লজ্জাজড়ানো অঙ্গের বাসে
ইঙ্গিত শুধু কাঁপিছে আভাসে;
শত কবি গাহে সহস্র ভাষে—
মনে মনে হেসে সারা হও।
কেন ইঙ্গিত? সুখে ও দুঃখে,
কী তার অর্থ? কথা কও—
নারী কথা কও। ('বউ কথা কও'/মরীচিকা)

(২) কে গো তুমি বংশীধারী
বাজাও বাঁশী কোন কূলে?
হৃদয় মম উদাস পারা
বেড়ায় ঘুরে' দিক ভুলে,

ধরার বুকে ঋতুর ঘটা,
বাঁশীর বুঝি রন্ধ্র ছ'টা !
বাজছে বাঁশী বার মাসই
মোহন তব অঙ্গুলে ;
কালিন্দীর ঐ কোন কূলে ? (বংশীধারী/মরীচিকা)

(৩) আমি বোধ হয় কোন জীবনে,
দূর অতীতের কোন ভুবনে,
ছিলাম কোন গুণীর হাতের বেহলা ;
অকারণের কান্না হাসি
মুখে যে মোর উঠছে ভাসি'
এ বুঝি সেই পূর্বজনমের দেয়ালা (বেহালা/ঐ)

(৪) সুনীল আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাস, বিমল নদীর জল,
গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি, সুন্দর ধরাতল !

তৃতীয়ত, কবির ঈশ্বর চিন্তার মধ্যেও দুঃখবাদের প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন সমালোচকবৃন্দ। তাঁর উপলব্ধিতে ঈশ্বর অত্যাচারী, মানুষকে নিষ্পেষিত করে তার কাছ থেকে দাসত্ব আদায়ই তাঁর কাজ। এতেই তাঁর সুখ। লোহা পেটানোতে কর্মকারের সুখ এবং সেটাই তার একমাত্র কর্ম। ঈশ্বরও নিষ্ঠুর কর্মকারের মত মানুষের সারাজীবন ধরে তাকে শুধু পিটিয়ে চলেন। এই পিটুনির মধ্য দিয়েই তার রূপান্তর সাধন করেন বিশ্বদেবতা। কিন্তু বস্তুত তা নয়। প্রথম কথা কবি আস্তিক। দুঃখবাদী কবির মত জগৎ ও জীবনের অন্তরালে বৃহত্তর কোন সত্যের উপলব্ধির অভাবে তিনি অস্থির এবং অস্থিত নন। ঐশ্বরিক অস্তিত্বে বিশ্বাস খাঁটি দুঃখবাদী কবির থাকা সম্ভব নয়। বার বার 'বন্ধু বন্ধু' বলে ডেকে এই ঈশ্বরের কাছে তাঁর যে বেদনা-নিবেদন, তা যেন মায়ের কাছে অভিমানী ভক্ত শাক্ত কবি রামপ্রসাদেরই আর এক রূপ। এটি তীব্র অভিমান-আচ্ছাদিত ভক্তিভাবেরই যেন এক বিশেষ প্রকাশ। জানি সুখ সম্ভব, জানি আনন্দ আছে (আছে বলেই তো না পাওয়ার বেদনা এত তীব্রতর), তবুও তাকে পাইনা—তাই তো কবির অভিমান ;ভক্তের অভিমান ভগবানের কাছে।

আসলে কবির ঈশ্বর উদাসীন বা মানুষের অত্যাচারী প্রভু নন, পক্ষান্তরে মানুষের বেদনায় তিনি নিজেও বেদনার্ত। দুঃখ আছে, এ-কথা অস্বীকার্য নয়, কিন্তু সুখও আছে। মহাকালের তাণ্ডব নর্তনে সুখ ও দুঃখের চক্রলীলা,—সকল কবির মতই এটি যতীন্দ্রনাথেরও কথা। এবং সেই দুঃখকে সকল সময় রোধ করা যায় না বলেই পরম কল্যাণময় মানব-প্রেমিক ঈশ্বরও কবির মতই বিচলিত। মানুষের দুঃখে দুঃখী এই কল্যাণময় ঈশ্বরের কাছেই কবি হৃদয়ভার লাঘব করতে চেয়েছেন। কখনো কখনো হয়তো দুঃখের অতি আঘাতে শাক্ত কবির মত তাঁর মুখ দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি তিরস্কার বেরিয়ে এসেছে,—কিন্তু তারই অন্তরালে কবির প্রকৃত স্বরূপ মনোযোগী পাঠকের কাছে অপ্রকাশিত থাকে নি।

কবির বিধাতা বা ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণার পরিচয় আমরা পাব নিম্নের উদ্ধৃতিগুলি থেকে—

(১) মাঝখানে তার রুদ্র পুরুষ
কে নাচে ঐ,
মরা বছরের বুকের উপর—
তাথৈ থৈ!
চরণে ধ্বনিছে প্রলয় ছন্দ,
নিমীল নয়নে সৃজনানন্দ,
ধবল অঙ্গে বিভল ভঙ্গী
মরণজয়ী।
ডম্বরু ডিমি মিশায়ে বিষাণে
কে নাচে ওই!

* * *

নাচে শিব, নাচে সুন্দর, নাচে
রুদ্র কাল!
জটায় গঙ্গা, ভালে শশী গলে
অস্থিমাল।

সাথে নেচে ফিরে আদি ও অন্ত,
ঘোরে দিক ওরে ঘোরে দিগন্ত,
সুখে দুখে ঠুকে ঘুরপাকে বাজে
রুদ্রতাল।
উছলে গঙ্গা, হাসে শশী দোলে
অস্থিমাল। (শিবের গাজন/মরীচিকা)

(২) তন্দ্রা টুটিয়া সহসা আজি যে সন্দেহ মনে জাগে,
হয়তো তোমায় বৃথা অনুযোগ করিয়াছি আগে আগে!
যাহা আছে যার তাহা ছাড়া আর কী পাবে সে দিতে?
অপার দুঃখ তোমা হ'তে তাই ঝ'রে পড়ে চারিভিতে!
হে বিরাট! আজ হেরি যেন তব দুঃখের নাহি ওর;
চিরবর্ষণে ফুরায় না তবু অফুরান আঁখিলোর!
(ঘুমের ঘোরে/সপ্তম ঝোক/ঐ)

(৩) সুখের দেবতা মরে যুগে যুগে, তুমি চির দুঃখময়,
সুখ বাঁচে মরে দুঃখ অমর,—তুমি মৃত্যুঞ্জয়।
বিরাট বক্ষে চিরনিরুপায় বিশ্বের ব্যথা বহি',
মাঝে মাঝে বুঝি ববম ববম্ জেগে ওঠে বিদ্রোহী!
পূজা পেয়ে হেসে আবার ঘুমাও আশুতোষ উদাসীন!
তোমার ব্যথার ম্লান সায়াহ্নে মিলায় দীনের দিন।
তবু শেষ হবে খেলা
—এই চির অবহেলা—
প্রলয় সন্ধ্যাবেলা। (শিব-স্তোত্র/মরুশিখা)

(৪) বিশ্বের ক্রন্দনে বিচলিত নারায়ণ,
আঁখি তার অশ্রুতে ভরিল,—
গোলোকে হ'ল না ঠাঁই, শিবজটা বাহি' তাই
শতধারা ধরণীতে ঝরিল।

হিমগিরি-নির্ঝরে তোমার জীবন গড়ে,—
মিথ্যা মা মিথ্যা এ কাহিনী ;
যুগে যুগে নরনারী-অফুরান-আঁখিবারি
পুষ্ট করিছে তব বাহিনী। (গঙ্গাস্তোত্র/মরুশিখা)

কবির ঈশ্বর রুদ্র। তাঁর চরণপাতে বিশ্বের প্রলয়,—এর স্বীকৃতি আছে প্রথম উদ্ধৃতিটির মধ্যে। কিন্তু এ কি দুঃখবাদ? ভারতীয় চেতনায় ঈশ্বরের দুইরূপ (কারো মতে বা তিন)—শিব ও রুদ্র, রক্ষক ও সংহারক বা স্রষ্টা ও সংহারক ;—এতো কোন দুঃখবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নয়। এতো সত্যকে সামগ্রিক ভাবে মিলিয়ে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গি। বিশ্বলীলার মধ্যেই রয়েছে এই দ্বৈত ভাব এবং সেই দ্বৈতভাবকে যিনি স্বীকার করেন, তাঁকে আংশিকতার ছাপ মেরে শুধু দুঃখবাদী বলা কি তাঁর প্রতি সুবিচার? এমনভাবে বিচার করলে সব কবিকেই (বিশেষত ভারতীয় কবি) তো দুঃখবাদী বলতে হয়। রবীন্দ্রনাথকে তো তাহলে সব থেকে বড় দুঃখবাদী বলা দরকার।

বস্তুত, উদ্ধৃতি কয়টির মধ্যে সুখ-দুঃখ মিলিয়ে নিয়ে যে পরিপূর্ণতা, তার সামগ্রিক স্বীকৃতির পরিচয়ই উদঘাটিত। প্রথমটির কথা বলছিলাম। সেটিতে বিধাতার রুদ্রশক্তি তথা প্রলয়ঙ্করী ক্ষমতার কথা রয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে 'নিমীল নয়নে সৃজনানন্দে'র কথা। তাঁর চরণ-ধ্বনিতে প্রলয়ানন্দ, কিন্তু তিনি আবার 'মরণজয়ী'ও বটে। তাঁর গলায় 'অস্থিমাল'—ধ্বংস ও বেদনার প্রতীক ; কিন্তু 'জটায় গঙ্গা',—নবজীবনরস এবং 'ভালে শশী'—আনন্দের ও রোমান্টিকতার পরিচয়-চিহ্ন। তাঁর রুদ্রনৃত্যের তাল দেয় সুখ ও দুঃখ সমভাবে। এই ঈশ্বরে যাঁর বিশ্বাস, তিনি কি দুঃখবাদী?

দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ উদ্ধৃতি তিনটিতে সমালোচকদের সিদ্ধান্ত যে ভুল তার প্রতি স্থির অঙ্গুলিনির্দেশ। দুঃখ আছে, ধ্বংস আছে এ-কথা মিথ্যা নয়, কারণ সামগ্রিক পূর্ণ সত্য তো সকল কিছুরই পূর্ণ সমন্বয়। তবুও যতটুকু বেদনা আছে, তার জন্যেই কবির ঈশ্বর নিজেই বেদনাপীড়িত, অশ্রুভারাক্রান্ত। মানুষের অসহনীয় বেদনায় তিনি নিজেই মাঝে মাঝে বিদ্রোহী। বিশ্বের ক্রন্দন-বিচলিত ঈশ্বরের অশ্রুপ্রবাহই ভাগীরথী রূপে মর্তে প্রবাহিত। মানুষের ও ঈশ্বরের—উভয়ের বেদনা-অশ্রুতে পুষ্ট এই প্রবাহিনী। এবং কবির ঈশ্বর চিরকাল এ-বেদনাকে সহ্য করবেন না। প্রলয়ের মধ্য দিয়ে অবসান হবে এই

যন্ত্রনা-বেদনা-দুঃখপূর্ণ মানুষের দুঃসহ দিনগুলির। এই প্রত্যয় যেখানে ঈশ্বর-উপলব্ধির চরম, সেখানে কবির ঈশ্বরকে মানুষের বেদনায় উদাসীন, মানুষের এক অত্যাচারী প্রভু বলা কবির প্রতি এবং কবির ঈশ্বরের প্রতি বিশেষ অবিচার। এই অবিচার না করতে চাইলে বলতেই হবে কবি দুঃখবাদী নন।

[তিন]
কবি-চেতনার পরিণতি

এবং চতুর্থত, কবি-চেতনার পরিণতির মধ্য দিয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারবো যে যতীন্দ্র-মানস একেবারেই দুঃখবাদী নয়। প্রেম আনন্দ এবং রোমান্টিকতাই তাঁর কবি-মানসের মুখ্য প্রত্যয় এবং কাব্যরূপের প্রধান নিয়ামক। আগে যা অন্তরালে বীজরূপে সংগুপ্ত ছিল তাঁর 'মরীচিকা'-'মরুশিখা'-'মরুমায়া' কাব্যত্রয়ীতে পরবর্তী কাব্যত্রয়ী 'সায়ম'-'ত্রিযামা'-'নিশান্তিকা'য় তারই অঙ্কুরোদ্গম ও বনস্পতি রূপ-ধারণ। কোন কোন সমালোচকের মতে কবির প্রথম যুগের বিদ্রোহ-চিহ্নিত (?) কাব্যের পরবর্তী কালে এই যে পরিবর্তন, তা তাঁর কবি চেতনার অবক্ষয়ের পরিচায়ক। শেষের তিনখানি কাব্যগ্রন্থে, তাঁদের মতে, কবিকণ্ঠ অনেক নিম্নগ্রামে নেমে এসেছে এবং কবির স্বধর্মচ্যুতি হয়েছে। কারও কারও মতে কবির শেষ পর্য্যায়ের কাব্যে অপরাহ্নিক ছায়াচ্ছন্নতার আমেজ, কেউ বা বলেছেন কবির জীবনদর্শন-বলিষ্ঠতার ক্ষীয়মানতা রয়েছে এর মূলে।

সমালোচকদের উপরিউক্ত মতবাদ—পরিণতিকে অবক্ষয় বলে নির্দেশ করবার প্রবণতা—যথেষ্ট ঘাতসহ নয়। স্বাভাবিক বিবর্তনের পথেই কবির উপলব্ধির ক্রমপ্রসার ও ক্রমগভীরতা লাভ। ফুলের দল গর্ভকোষকে আবৃত করে রাখে। তখন সেই ফুলদলগুলির বর্ণ ও গন্ধে উচ্ছ্বসিত কেউ যদি পরবর্তীকালে তার অন্তরালস্থিত অনতিব্যক্ত বীজের উদ্ভবকে গাছের অবক্ষয় বলে মনে করে, তা কি সত্য মূল্যে স্বীকার করা যায়? ফুলদলের বর্ণবিচ্ছুরিত গন্ধামোদিত প্রচারে বিভ্রান্ত আভ্যন্তরীণ সত্য দর্শনের অক্ষমতার দায় গাছের উপর চাপান ঠিক নয়। গর্ভকোষে যে ধীরে ধীরে বীজের সঞ্চার হচ্ছিল, এবং এমনতর বীজসৃষ্টি ও ধারণের প্রবণতা যে ঐ বিশেষ গাছের

ছিল, সেটি গাছটিকে ভাল করে লক্ষ্য (Study) করলেই বোঝা যেত। সত্যই তথাকথিত দুঃখবাদের বর্ণালিবিচ্ছুরিত অন্তরালে কবি যে ভিন্নতর বিশ্বাসকেই ধারণ করে ছিলেন, তা দেখানর চেষ্টা আমরা করেছি। অতএব পরবর্তীকালে সেই প্রত্যয়ের সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা যদি দেখি, তবে তাকে অবক্ষয় না বলে স্বাভাবিক পরিণতি বলেই স্বীকার করতে হয়।

বিবর্তন সত্য। যে প্রকৃতি-জগৎ আমাদের সকল অভিজ্ঞতার মহা-পাঠশালা সেখানেও ঐ একই কথা। সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে আমাদের পৃথিবী যখন সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে এসেছিল, তখন সেও ছিল একটি অতিউত্তপ্ত অগ্নিগোলক। সেই অগ্নিগোলক পরে ধীরে ধীরে শীতল হতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু তবুও তখনও চলেছে ক্ষণে ক্ষণে তার মাথাঝাকানি আর উগ্নি-উদগার—ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাত। কিন্তু ধীরে ধীরে তাও শান্ত হয়েছে, কালক্রমে তার উপর পড়েছে শীতল পলির প্রলেপ, দেখা দিয়েছে শ্যামলিমা-স্নিগ্ধতা। এই বিবর্তন আছে বলেই পৃথিবীতে জীবন সম্ভাবিত হয়েছে, প্রাণশক্তি তার লীলা প্রকাশ করতে পেরেছে। আর তার ফলেই সৃষ্টি একই চিরাচরিত রূপের বৈচিত্র্য-হীনতায় ব্যর্থ হয়ে যায়নি, নব নব সার্থকতায় ধন্য হয়েছে। আমাদের কবিও ঠিক তেমনি। প্রথম যুগে অগ্নি-উদগার ছিল বটে, কিন্তু তারই তলদেশে ছিল পূর্ণ সত্যবীজের উপলব্ধি। বিবর্তনের ফলে সেই অগ্নি-উচ্ছ্বাস শান্ত হয়েছে, দেখা দিয়েছে স্থিরপ্রত্যয়ের শ্যামল স্নিগ্ধতা। এসেছে প্রেম, সৌন্দর্য, রোমান্টিকতা, কল্পনা—মরুভূমির বুকে প্রকাশিত হয়েছে পুষ্পগুচ্ছ। এ কি কবিচেতনার অবক্ষয়, না, সুস্থ পরিণতি? যতীন্দ্রনাথের কবি-স্বরূপের প্রাণবীজ চিরাচরিত পরিবর্তনহীনতার সীমাগতিতে ব্যর্থ না হয়ে বিশেষ একটিমানস-প্রবণতার গতিহীন অন্ধ বেড়জালকে অতিক্রম করেছে। এটি তাঁর প্রাণশক্তিরই প্রকাশ, অবক্ষয়ের নয়। প্রথম জীবনের রুক্ষ কঠোর শীলাস্তীর্ণ তপ্ত প্রান্তর পরবর্তী কালে শ্যামল বনভূমিতে পরিণত হয়েছে। এক রূপকে অতিক্রম করে রূপবৈচিত্র্যকে তিনি প্রকাশসার্থক করে তুলেছেন। এর জন্যই তিনিই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণীয়; অন্যথায় তাঁকে বন্ধ্যা কবি বলে দূর থেকেই প্রণাম করতাম।

এবার সেই বিবর্তনের পরিচয় দেওয়া যাক। আঙ্গিকের তীক্ষ্ণতা ও ভাবের তীব্রতা রোমান্টিকতা-প্রেম-সৌন্দর্যের যে-বীজকে অন্তরালিত রেখেছিল

'মরীচিকা'-'মরুশিখা'-'মরুমায়া' কাব্যত্রয়ীতে (যদিও ক্ষণে ক্ষণে তার বিদ্যুৎ-দীপ্ত আত্মপ্রকাশকে একেবারে চেপে রাখা যাচ্ছিল না), সেই বীজের সুস্পষ্ট ও অকম্পিত অঙ্কুরোদ্‌গম সুরু হল 'সায়ম' রচনার কাল থেকে। এই অঙ্কুর 'ত্রিযামার' মধ্য দিয়ে 'নিশান্তিকা'য় এসে পূর্ণ পরিণতরূপ ধারণ করেছে। যে-বাংলার শ্যামল মৃত্তিকায় বসে কবি মরুভূমির স্তবগান রচনা করেছিলেন, তার হাস্যকরতা কবি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছেন। তাঁর সন্দেহ জেগেছে নিদাঘ-তপ্ত মরুভূমির পূর্বতন সপ্রয়াস স্তুতিতে—

নব যৌবন সবে,—
বসন্ত ছাড়ি' যোগ দিয়েছিনু নিদাঘ-মহোৎসবে।
বাংলায় ব'সে ভালবেসেছিনু সুদূরের মরুভূমি,
সে ছিল না মোর ক্ষণিক খেয়াল সে কথা জানিতে তুমি।
দিগন্তহারা অন্তরে মম বালুর শয্যা পাতি'
আগুনের খেলা কবে হবে বলে কাটাইনু দিনরাতি।
· · · আজও কি রাখিব আশা ?
যে মহামরুরে ভালবাসি আমি, পাব তার ভালবাসা ?
বন্ধু, হাসিছ তুমি,—
ভালবাসা যদি ফিরে দেয় তবে কিসের সে মরুভূমি ?
(চিব বৈশাখ/সায়ম্)

প্রথম যৌবনে যে যন্ত্রণার উপলব্ধি ও বিদ্রোহ কবির প্রকৃত রসানুভবের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছিল, তা ক্রমশ সংস্কারমুক্ত হয়ে উঠেছে। একদিন কবি-মানসের যে উপলব্ধি কবিকে জীবন সুধার উৎস থেকে ভিন্নমুখে পরিচালিত করেছিল, কবি বুঝেছেন, সেটি উৎসের দোষ নয়, তাঁরই জীবন-দর্শনের অক্ষমতা। তারই সবিনয় স্বীকৃতি—

যে মোহিনী স্বর্ণটাটে পাতে পাতে সুধা বাটে
সে যাদের করে প্রবঞ্চনা,
হে মোর বঞ্চিত রাজ নিঃশেষে বুঝেছি আজ—
আমি যে তাদেরি একজনা।

তাই তুমি নানা ছলে আমার অন্তরতলে,
আমার দুয়ারে আঙিনায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসো কাঁদি বলে ভালোবাসো,
মোর অশ্রু তোমারে কাঁদায়।
তোমার প্রসাদকামী স্বগৃহে সন্ন্যাসী আমি
এ জীবন নিষ্ফলে সফল—
অনাদি দুঃখের স্রোতে তোমারি নয়ন হতে
ঝরে-পড়া একফোঁটা জল ॥ (কচি ডাব/সায়ম্)

রৌদ্রদগ্ধ তপ্ত মরুভূমি থেকে কবি যখন 'সায়মে'র শান্তির মধ্যে এসে পেঁ ৗছিয়েছেন, দীপ্ত মধ্যাহ্ন যখন অপরাহ্নিক স্নিগ্ধ আলোকস্পর্শে সহনীয় হয়ে উঠল, তখন কবির অনুভূতি,—ক্ষুধা আছে এ-কথা মিথ্যা নয়, কিন্তু সুধাও আছে। পুরুষের এই ক্ষুধা নারীর সুধার সঙ্গে মিলিত হয়ে ধরিত্রীতে নব অমৃতবাহী শিশুদের আগমন সম্ভাবিত করে। এই আনন্দ উৎসবকে অস্বীকার করে কোন মূর্খ?—

আমরা দু-জনে চলেছি বহিয়া,
অনাদি যুগের অনেক বোঝা,
অসীমপুরের রাজপথে-পথে
ফেরি হেঁকে হেঁকে গাহক খোঁজা!
তোমার মাথায় সুধার পশরা,
আমার মাথায় ক্ষুধার ডালা,
ক্ষুধায় সুধায় পাশাপাশি, তবু
নিবাতে পারিনে এ ওর জ্বালা।
* * * *
অসীম পথের নূতন পান্থে
একে একে তুই আনিস্ ডাকি',
কচি কচি শিরে বোঝা তুলে দিস্,
আমি বিস্ময়ে চাহিয়া থাকি। (বোঝা/সায়ম্)

তবুও কবিতাটি একেবারে পুরাতন চেতনামুক্ত নয়। কারণ সায়ম্ transition period-এর কাব্য। মরুমায়ার রৌদ্রদগ্ধ আকাশে সায়মের

ছায়া ঘনিয়ে এসেছে মাত্র, এখনও 'ত্রিযামা'র অন্ধকারের মধুর প্রশান্তি ও 'নিশান্তিকা'র প্রভাত বায়ুস্পর্শিত উপলব্ধি দূরে অপেক্ষমান।

রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রানুসারী যে-কবিদের প্রতি বক্রতির্যক কাব্যকটাক্ষ কবির কবিতার ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে এক খরদীপ্ত রূঢ়তার সৃষ্টি করেছিল, সেই কবির কাব্য সায়মে এসে রবীন্দ্রনাথের সুস্থ ও বলিষ্ঠ জীবনকে অভিনন্দন জানিয়েছে। তাঁর কাছে নিদাঘের তপ্ততা সুদুঃসহ হয়ে 'পদ্মবনের গন্ধবহের' জন্য কামনাটুকু অপরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে। এবং একদা অবহেলিত প্রেম সমস্ত সায়ম-কাব্যে বার বার তার করুণ অঙ্গুলিস্পর্শ বুলিয়েছে। (দ্রঃ রবিপ্রণাম এবং ভ্রমর/সায়ম)।

সায়মের মধ্যে এই যে অপরাহ্নিক ছায়াচ্ছন্নতা, ত্রিযামায় তারই গাঢ়তর রূপ। দিবাবসানে ক্রমশ কবির যাত্রা নিশীথের বিশ্রামশান্ত অন্ধকারের দিকে। মরুভূমিসচেতন তীব্র-তীক্ষ্ণ জীবনজিজ্ঞাসা সায়মে সংশয়াকীর্ণ এবং ত্রিযামায় এসে তা স্থির নিশ্চিত বিশ্বাসের সঙ্গে অন্ত্যপ্রান্তের দিকে হেলেছে। সায়মের সন্ধিকাল কাটিয়ে কবিচেতনা ক্রমশ জীবনের বিপরীত প্রান্তের দিকে দৃঢ়পদে অগ্রসর হয়েছে। ত্রিযামায় তাই আশ্চর্য বিশ্বাসের সঙ্গে একদা উপেক্ষিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে কবির আনন্দ-আবিষ্কার,—

> বসন্তে উপেখিনু ফুলে ফুলে মিনতি,
> বর্ষায় মেঘে মেঘে আহ্বান,
> হেমন্ত-সন্ধ্যায় মাঠে মাঠে মন ধায়
> কোন সুন্দরে করি সন্ধান!—
> হেমন্ত-সন্ধ্যার বন্ধু! (হেমন্ত সন্ধ্যায়/ত্রিযামা)

পূর্বতন জীবনে যে-সুন্দর কবির অন্তর-দ্বারপ্রান্তে বার বার এসে দাঁড়িয়েছে, নির্বোধ উগ্রতায় কবি বার বার তাকে অস্বীকার করেছেন; সায়মে তারই জন্য ব্যগ্র উদ্বেলতা,—

> ওগো সুন্দর, আমার জীবনে
> আনন্দরূপে ফুটিবে না কি?
> সজল এ চোখে রাখিবে না তব
> হাস্য-উজল মোহন আঁখি?

মেঘল প্রভাতে আলোকের দল
গুটালো অরুণ মর্মকোষে,—
কত সাধনায় সুন্দরে পেয়ে
কাঁদিয়া কাঁদানু কর্ম দোষে। (সুন্দর/সায়ম্)

এবং ত্রিযামায় তারই স্মৃতি-উৎসব,—

জাগে গুঞ্জন উথলে গন্ধ
রসের সাগরে রূপের ছন্দ
শতদলে উঠে দুলিয়া।
একবার ছিঁড়ে হারানো ছড়ানো
বার বার গেঁথে কণ্ঠে জড়ানো,—
আপন নিজনে সৃজন-লয়ের
লীলা-মঞ্জুষা খুলিয়া!
আমি যদি আছি সব তবে আছে
এ মোর জীবনে মরণও যে বাঁচে,
মোর দ্বারে জরা যৌবন যাচে,—
মিছে কেন বৈরাগ্য?
আমারি লীলায় যা আসে যা যায়
থাকে থাক্ যায় যাক গো॥ (অদ্বয়/ত্রিযামা)

নূতনভাবে এই জীবনকে উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে এসেছে গাঢ়তর প্রেমের অনুভূতি। এই প্রেমকে কবি যৌবনে অবহেলা করেছিলেন, কিন্তু আজ সকল সুন্দরের সফল উপলব্ধির জন্য তাঁর দীক্ষা গ্রহণ তাঁর প্রেয়সীর কাছ থেকে,—

হে আমার জ্যোতি, হে আমার সতি,
গৃহিণি, সচিব, সখি, হে প্রিয়া,
তোমারই তনুর ঝরণা ঝারায়
আজও সুশীতল আমার হিয়া।
তারই গৌরবে গরবী যে আমি,
তারই দানে ধনী করেছে সে যে,
পলাশের ঝরা পলাশে যেমন
পলাশের তলা চৈত্রশেষে।

তাহারই পরশ অমৃত-সরস,
দরশ তাহার নয়ন-রম,
সে তনু নোয়ায়ে তুমি প্রণমিলে
মনে মনে বলি—নমো হে নম,
নমো নমো নম সুন্দরতম
আমার প্রিয়ার মোহন দেহ,
যুগে যুগে দেয় পরমানন্দ
নরকের দ্বার বোলো না কেহ।

(মন্ত্রহীন/সায়ম্)

একদা যে কবি জড়ত্বকেই জগতের পরম সত্য বলে মনে করেছিলেন, আজ সেই কবি জড়ত্বের কেন্দ্রে চেতনা-র সত্যটিকে পুষ্পকোরকের মত আবিষ্কার করতে পেরেছেন। তথাকথিত জড়-দুঃখবাদী কবির পরিণতি সৌন্দর্যতন্ময়তায় ও প্রেমানুভূতিতে। প্রেম ও সৌন্দর্যকে পরিহার করে জড় ও দুঃখ চেতনার মধ্যে যে সচেতন কবিমানস সারা জীবন সকল সমস্যার সমাধান খুঁজে ফিরেছে, জীবনসায়াহ্নে সেই হারাণো প্রেম-সৌন্দর্যের জন্য আর্তকণ্ঠ হাহাকার,—

যৌবনে আমি করিনু ঘোষণা,—
"প্রেম ব'লে কিছু নাই,
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।"
সেই সমাধান সমাগত যবে আজ,
আসন্নপ্রায় জড়ত্বে লাগে কোন চেতনার ঝাঁজ?

যে-দাবদাহনে দাহন করিয়া এ জীবন পোড়ালেম,—
আজ মনে হয় এ দগ্ধভালে সেই ছিল মোর প্রেম।
যারে বলেছিনু—নাই,
চেতনার কূলে বসি চিতামূলে গায়ে মাখি তারি ছাই
আজ পথে পথে ধূলা ঘেঁটে মরি খুঁজে তারি পদচিহ্ন,
ঘাটে ঘাটে ডুবি,—যদি হাতে ঠ্যাকে তারি উত্তরী ছিন্ন।

কাঁটার আঘাতে ফোঁটায় ফোঁটায়
পথের প্রান্তে বোঁটায় বোঁটায়
রক্ত কুসুম যত ফুটেছিল কোথায় তাদের খুঁজি ? (সমাধান/ত্রিযামা)

এবং কবির ব্যথাদীর্ণ অবচেতন মনের আত্মপ্রকাশ ও স্বীকৃতি,—

আজ চেতনার কুজ্‌ঝটি-কূলে
নির্বাপিত এ তব চিতামূলে
যৌবন-বেচা জরা বিনিময়ে জড়ত্ব বরিয়াছি। (ঐ)

কবি বুঝেছেন,—

(যদিও) আকাশ নিতান্ত নীল মৃত্যুমদিরায়,
(তবু'ও) জীবনের নেশা কাঁপে তারায় তারায়।
(রোগশয্যায়/ত্রিযামা)

ত্রিযামার এই যে সৌন্দর্য-মাধুর্য-বিশ্বাস-সুখ নির্ভর কবিমানস তার পরিপূর্ণতা নিশান্তিকার কবিতাগুলিতে প্রকাশিত। কবির অবচেতন মনের অন্তরালস্থিত বিশ্বাস-মাধুর্য-সৌন্দর্য-আনন্দ-বিধৃত রোমান্টিক পুষ্পকোরকটির শতদলে আত্মপ্রকাশ নিশান্তিকা কাব্যগ্রন্থে। রোমান্টিক কবিদের যে অলৌকিক আনন্দকে কবি বার বার ব্যঙ্গ-কটাক্ষে বিদ্ধ করেছেন, তার অসারত্বের দিকে করেছেন অকম্পিত অঙ্গুলিনির্দেশ, আজ সেই অলৌকিককেই জানিয়েছেন আন্তরিক আহ্বান, পেতে চেয়েছেন একদা অস্বীকৃত প্রিয়ার স্পর্শ, প্রিয়াহীন ভগ্নস্বপ্নকে অসহ্য মেনেছেন এবং পূর্বজীবনের ভুলের জন্য নিজের উপর ধিক্কার হেনেছেন,—

(১) স্বপনে দুঃস্বপ্ন ভাঙি'
কাঁদিয়া উঠি' কহিনু আমি,—
স্বপ্ন তবে সত্য ? তুমি নাই !
বুলায়ে হাত সান্ত্বনিয়া
গভীর স্নেহে কহিলে প্রিয়া,—
ছি ছি ছি, অত অধীর হোলে তাই ?
বক্ষে মুখ লুকায়ে কহি,—
কেমনে বল শান্ত রহি ?
তোমারে শেষে হারাতে যদি হোল !

অসহ মম এ জাগরণ,

করগো এরে দুঃস্বপন

ও-মুখ হোতে নাই-এর ঢাকা খোল।

(সুপ্তিলোক/নিশান্তিকা)

(২) কবি যে হবে সে জেনো নিঃসন্দেহ

বাংলায় বোসে ভাবেনা সাহারা গোবি।

চারিদিকে মোর শ্যামল গন্ধ গীতি,

কত হাসি মুখ কত স্নেহ কত প্রীতি,

আলো-ছায়া সুখ-দুঃখ ;

সে-সবে আমার নেশা ধরিল না চোখে,

মন বসিল না প্রেমের অলকা-লোকে

ভরিল না খালি বুক। (কবি নহি/নিশান্তিকা)

এবং শেষ পর্যন্ত সেই সর্ববস্তুঅতীত অলৌকিকের পদসঞ্চার কবিজীবনে,—

যে-আলো নয়নাতীত সেই আলো তাতে তার,

যে-বোঝা বহনাতীত সেই বোঝা গাথে তার,

তোরই জ্বালা সহিতে

তোরই বোঝা বহিতে

এতদিনে অবসর পেল সে। (ভোর হ'য়ে এল/ঐ)

এই প্রত্যয়ে যে-কবিচেতনার শেষ আশ্রয় এবং যে প্রত্যয়ের দিকে জীবনের সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কখনও পরোক্ষে কখনও প্রত্যক্ষে, কখনও অস্ফুট, কখনও পূর্ণব্যক্ত পদচারণা, সেই কবিচেতনার মূল মর্মকে দুঃখবাদী বা জড়বাদী বলে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের পূর্বতন সিদ্ধান্ত।

[চার]
উৎস

কবির এই তথাকথিত দুঃখবাদের উৎসরূপে রবীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রানুসারী কবিদের অতি পেলব কাব্যাঙ্গিকে ধৃত রোমান্টিকতার প্রতিক্রিয়াকে নির্দেশ করবার বিশেষ প্রবণতা সমকালীন সমালোচকদের মধ্যে লক্ষণীয়। তাঁদের মতে যতীন্দ্রনাথ যখন কাব্যজীবন সুরু করেছেন, তখন সমাজের একদিকে চলেছে অবক্ষয় ও ভাঙন এবং অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মভাবসমৃদ্ধ পদলালিত্য। রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রানুসারী যে-কবিসমাজ এই যুগগত ভাঙনের দিকে বিমুখদৃষ্টি হয়ে তাঁদের দীর্ঘ কুন্তল ও গেরুয়া বসন নিয়ে রোমান্টিক অতি ভাবালুতার স্তুতিকারী হয়েছিলেন, সেই সব ক্ষীণজীবী দুর্বল জীবনদর্শন সম্পন্ন লতায়িত কবিদের অতি নমনীয় কাব্যপেলবতা যতীন্দ্রনাথের মনে এমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, যার ফলে তিনি বাংলার শ্যামল মাটিতে বসে মরুভূমির তরল অগ্নি পান করবার জন্য ব্যগ্র হয়েছিলেন। সমাজের অবক্ষয়কে অস্বীকার করে কাব্যের মধ্যে শান্তির আশ্রয় অন্বেষণের এই প্রচেষ্টাকে কবির কাছে ফাঁকি বলে মনে হয়েছে। সৃষ্টিকে পরিপূর্ণরূপে দেখতে হলে সহজ বিশ্বাসমুগ্ধতা ও স্বপ্নসুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শুধু দেখলেই চলে না, বেদনা যন্ত্রণা ও অবক্ষয়ের দিকেও দৃষ্টিসঞ্চার করা দরকার। তাই রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রানুসারী কবিদের কাব্যচিন্তার বিরুদ্ধে যতীন্দ্রনাথের সচেতন বিদ্রোহ; তাই বলা হয় যতীন্দ্রনাথের কবিপ্রত্যয়ের মূল সমকালীন যুগ-মানসের প্রতিক্রিয়াজাত। যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদের উৎসরূপে উক্ত কারণ নির্দেশই সমালোচকগণ করেছেন।

কোন বক্তব্যের আঙ্গিক তখনই দীপ্ত, প্রবল প্রাণ-প্রাচুর্য্যে পূর্ণ, পাঠকের তীব্র আত্মানুভূতি উদ্বোধনকারী হতে পারে, যখন সেই বক্তব্যটি কবির স্থির প্রত্যয়কে বহন করে, যে-প্রত্যয় কবির হৃদয়তলোত্থিত, অকপট, সৎ (sincere), তাঁর চেতনার সঙ্গে আন্তরিকভাবে বিমিশ্রিত। অন্যথায় তা ভঙ্গিসর্বস্ব, কপট; অপরের কাছে তার আবেদন হয়তো বুদ্ধিগ্রাহ্য, কিন্তু হৃদয়গ্রাহী নয়। যতীন্দ্রনাথের কাব্য যদি স্বকীয় আন্তর-ভাব এবং কোন সহজাত অন্তর্থক প্রত্যয়কে ধারণ করে না থাকতো, যদি তা কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রানুসারী কবিদের প্রতিক্রিয়াজাত মাত্র হতো, তবে তা এত কাব্য-সৌন্দর্যে অভিষিক্ত, প্রাণপূর্ণ, স্ফূর্তআবেগ, দ্রুতি ও দীপ্তির সার্থক সমন্বয়-বিধৃত কাব্য

হতে পারতো না বলে মনে করি। হয়তো সমকালীন কোন শিথিল ভাববাহী জোলো রোমান্টিক উচ্ছ্বাসসর্বস্ব কাব্যের প্রতিবাদ করবার জন্য কবির কাব্য রচনার সুরু, কিন্তু পরবর্তীকালে কবির নিজস্ব বিশ্বাসের সঙ্গে মিশে যাওয়াতেই, তাঁর কবিতায় সত্যের প্রতিষ্ঠা এত স্বত-উজ্জ্বল, সেই জন্যই এত দ্রুত তার আবেদন পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয়ে যায়। কেবল একটি যুগগত রোমান্টিক বক্তব্যের তথাকথিত বিরোধিতা করবার জন্য রবীন্দ্র ও তদনুসারীদের প্রতি বিরক্ত কবির বক্তব্য এত প্রবল ও চেতনা-আন্দোলনকারী হতে পারে না। কোন প্রতিক্রিয়ার ফল যে-কবিতা তা কি এমন আবেগসৃষ্টিতে সমর্থ?

যে রবীন্দ্র-ভাবচেতনার প্রতিক্রিয়ায় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্যরচনা বলে মনে করা হয়, সেই রবীন্দ্রনাথে যতীন্দ্রনাথের কাব্যরচনা সুরুর বহু আগে যতীন্দ্র-সমধর্মী বক্তব্য কিছু কম ছিল না। তবে রবীন্দ্রনাথ সামগ্রিকতার কবি, কেবল সুখ বা দুঃখের কবি নন। জগৎসত্য যেমন সুখ ও দুঃখ উভয়কে ধারণ করে আছে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও তেমনি। এই সমন্বিত সুখ ও দুঃখকেই তিনি নাম দিয়েছেন আনন্দ। আনন্দ অর্থে কেবলমাত্র সুখ নয়। জীবনবাদী রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও যতীন্দ্রনাথের মত মানুষের দুঃখ, যন্ত্রণা, হতাশা, পীড়ন, শোষণ, রুক্ষতা, কঠোরতা, কামনা, আকাঙ্ক্ষা, অবক্ষয়, জড়ের অন্ধ নির্দয়তার পরিচয় প্রভৃতি কিছু কম ছিল না, এবং তার সুরু যতীন্দ্রনাথের কাব্য রচনার অনেক আগে থেকে এবং রবীন্দ্রজীবনের শেষ পর্যন্ত তা প্রসারিত। অসংখ্য উদাহরণের মধ্য থেকে স্থানাভাবে আমরা অল্প কয়েকটি উদাহরণ দেব। উদাহরণগুলি যতীন্দ্রনাথের কাব্য সুরু করার আগেরই অর্থাৎ বাং ১৩১৭-র আগের—

(১) খণ্ড খণ্ড রবি শশী, চূর্ণ চূর্ণ গ্রহ তারা
বিন্দু বিন্দু আঁধারের মতো
বরষিছে চারিদিক হতে,
অনলের তেজোময় গ্রাসে
মুহূর্তেই যেতেছে মিশায়ে।
সৃজনের আরম্ভ সময়ে
আছিল অনাদি অন্ধকার,
সৃজনের ধ্বংসযুগান্তরে
রহিল অসীম হুতাশন।

অনন্ত আকাশগ্রাসী অনল সমুদ্র-মাঝে
মহাদেব মুদি ত্রিনয়ন
করিতে লাগিলা মহাধ্যান ॥
(সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়/প্রভাত সঙ্গীত)

১২৮৮ বঙ্গাব্দে রচিত কবিতাটির সঙ্গে, ১৩১৭য় রচিত যতীন্দ্রনাথের 'বহ্নিস্তুতি' কবিতাটি তুলনীয়। আঙ্গিক সম্পূর্ণ ভিন্ন. কিন্তু ভাব-প্রত্যয়ের দিক দিয়ে খুব কাছাকাছি।

(২) জীবনের পিছে মরণ দাঁড়ায়ে, আশার পিছনে ভয়—
ডাকিনীর মত রজনী ভ্রমিছে
চিরদিন ধরে দিবসের পিছে
সমস্ত ধরাময়।
যেথায় আলোক সেইখানে ছায়া এইতো নিয়ম ভবে
ও রূপের কাছে চিরদিন তাই এ ক্ষুধা জাগিয়া রবে ॥
(রাহুর প্রেম ছবি ও গান/১২৯০ বঙ্গাব্দ)

(৩) নাই সুর, নাই ছন্দ, অর্থহীন নিরানন্দ
জড়ের নর্তন।
সহস্র জীবনে বেঁচে ওই কি উঠেছে মেতে
প্রকাণ্ড মরণ।
জল বাষ্প বজ্র বায়ু লভিয়াছে অন্ধ আয়ু,
নূতন জীবনস্নায়ু টানিছে হতাশে—
দিগ্বিদিক নাহি জানে, বাধা বিঘ্ন নাহি মানে,
ছুটেছে প্রলয় পানে আপনারি ত্রাসে।
(সিন্ধু তরঙ্গ/মানসী/১২৯৪ বঙ্গাব্দ)

(৪) কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল। কোন্ অন্ধ কারা মাঝে জর্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায়। স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান

লক্ষ মুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার, সংকুচিত ভীত ক্রীতদাস
লুকাইছে ছদ্মবেশে।

(এবার ফিরাও মোরে/চিত্রা/১৩০০ বঙ্গাব্দ)

(৫) ওই রে নগরী, জনতারণ্য— শত রাজপথ গৃহ অগণ্য,
কতই বিপণি, কতই পণ্য, কত কোলাহল কাকলি
কত-না অর্থ কত অনর্থ আবিল করিছে স্বর্গমর্ত,
তপনতপ্ত ধূলি-আবর্ত উঠিছে শূন্য আকুলি।
সকলি ক্ষণিক খণ্ড ছিন্ন পশ্চাতে কিছু রাখে না চিহ্ন,
পলকে মিলিছে, পলকে ভিন্ন, ছুটিছে মৃত্যু পাথারে।
করুণ রোদন, কঠিন হাস্য, প্রভুত দম্ভ, বিনীত দাস্য,
ব্যাকুল প্রয়াস, নিঠুর ভাষ্য চলিছে কাতারে কাতারে।

(নগর সংগীত/চিত্রা/১৩০২ (?) বঙ্গাব্দ)

(৬) এ নহে মুখর বনমর্মরগুঞ্জিত,
এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে।
এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুসুমরঞ্জিত,
ফেনহিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে।
কোথা রে সে তীর ফুলপল্লবপুঞ্জিত,
কোথা রে সে নীড়, কোথা আশ্রয় শাখা।
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা॥

(দুঃসময়/কল্পনা/১৩০৪ বঙ্গাব্দ)

(৭) ছায়ামূর্তি যত অনুচর
দগ্ধতাম্র দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হতে ছুটে আসে।
কী ভীষ্ম অদৃশ্য নৃত্যে মাতি উঠে মধ্যাহ্ন-আকাশে
নিঃশব্দ প্রখর
ছায়ামূর্তি তব অনুচর॥

মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাস
রহি রহি দহি দহি উগ্রবেগে উঠিছে ঘুরিয়া,
আবর্তিয়া তৃণপর্ণ, ঘূর্ণছন্দে শূন্যে আলোড়িয়া
চূর্ণ রেণুরাশ
মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ ॥
(বৈশাখ/কল্পনা ১৩০৬ বঙ্গাব্দ)

(৮) তোমার শ্মশানকিঙ্করদল
দীর্ঘ নিশায় ভুখারি
শুষ্ক অধর লেহিয়া লেহিয়া
উঠিছে ফুকারি ফুকারি।
অতিথি তারা যে আমাদের ঘরে
করিছে নৃত্য প্রাঙ্গণ' পরে,
খোলো খোলো দ্বার ওগো গৃহস্থ,
থেকো না থেকো না লুকায়ে—

হৃদয়পিণ্ড ছিন্ন করিয়া
ভাণ্ড ভরিয়া দেহো রে।
ওরে দীনপ্রাণ, কী মোহের লাগি
রেখেছিস মিছে স্নেহ রে। (সুপ্রভাত/১৩১৩ বঃ

অধিক উদাহরণের দরকার নেই। কারণ উপরের উদাহরণগুলিতেই আমাদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত। তবু আর একটি উদাহরণের লোভ সংবরণ করতে পারছি না। রবীন্দ্র-কাব্যের ভাব-চেতনার সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের কী আশ্চর্য মিল ছিল, তা দুজনের সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে রচিত দুটি কবিতার উদ্ধৃতি থেকে বোধগম্য হবে। যতীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতিটি তাঁর transition কালের কাব্য সায়ম থেকে যার রচনাকাল ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ। আর রবীন্দ্রনাথেরটি তাঁর 'কল্পনা' কাব্য থেকে এবং কবিতাটির রচনাকাল ১৩০৫-এর চৈত্রশেষ।

প্রথমে রবীন্দ্রনাথের থেকে উদ্ধৃতিটি—

শ্যেনসম অকস্মাৎ ছিন্ন করে উর্ধ্বে লয়ে যাও
পঙ্ক কুণ্ড হতে,
মহান মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি করে দাও
বজ্রের আলোতে ॥ (বর্ষশেষ)

যতীন্দ্রনাথের কবিতাংশ.—

হে চির নির্মম হে মম প্রিয়তম
সোনার পিঞ্জরে দুয়ার খুলে দাও,
স্নেহের সোহাগের পরশ বুলাইয়ে
বাহুতে দুলাইয়ে আকাশে তুলে দাও। (প্রেম-পিঞ্জর)

সুতরাং রবীন্দ্র ভাব-চেতনার প্রতিক্রিয়াতে যতীন্দ্রনাথের মানস-প্রত্যয়ের কাব্যিক অভিব্যক্তি তথা তাঁর দুঃখ-চেতনার আত্মপ্রকাশ এ-কথা স্বীকার করা কিছুতেই সম্ভব নয়। হয়তো এ-টুকু স্বীকার করা যায় যে রবীন্দ্রানুসারীদের সুখ-বিলাসবাদ তাঁর সচেতন-প্রয়াস অ-রোমান্টিক ভাব-চেতনার উদ্বোধনে catalytic agent (অনুঘটক)-এর কাজ করেছিল, কিন্তু পরে তাঁর সহজাত অবচেতন মানস-অন্তর্লীন সূক্ষ্ম রোমান্টিক সৌন্দর্যসঞ্চরী কাব্যবীজই জাগ্রত হয়ে ওঠে। এ-বিষয়ে কবির নিজস্ব কিছু বক্তব্য উদ্ধার করা যাক—

"আমার বাল্যকাল থেকে কখনও ভাবিওনি যে আমি কবি হবো। কবি হতে চাইওনি। লেখাপড়া শিখলাম, ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করলাম। আমি পাশ করা ইঞ্জিনিয়র। স্বভাবের মধ্যে এক দুঃস্বভাব জেগেছিল হঠাৎ। সেটা হচ্ছে কবিদের পিছনে লাগা। তাদের ঠাট্টা।·····আমি ইঞ্জিনিয়র। বুঝি বস্তু।······অর্থাৎ এক কথায় বস্তুতান্ত্রিকতা—Materialism। কাজেই এটা তো সোজা কথা—কবিদের ভাবালুতা আমার কাছে হাস্যকর বলে মনে হবেই।······তারই বিরুদ্ধে বিদ্রূপের বাণ ছুড়বার ইচ্ছা জাগলো আমার মনে। কিন্তু তার আঙ্গিক কেমন হবে? ভেবে দেখলাম পদ্যবাণ নিক্ষেপই বাঞ্ছনীয়। ওদের অস্ত্র দিয়েই ওদের আঘাত হানতে হবে। তাই লেগে পড়লাম।······(কিন্তু) ওঁদের উৎখাত করা গেল না। উপরন্তু······বাংলার কবিদল, অর্থাৎ আমার শত্রুদল—(আমাকে দেখিয়ে) চেঁচিয়ে উঠলেন, —কবি—কবি—কবি—"

অর্থাৎ কবির সজ্ঞান অভিপ্রায়ে কবি হওয়ার ইচ্ছা না-থাকলেও তিনি কবিই হয়ে উঠেছেন, কারণ সেটিই তাঁর স্বরূপ, তেমনি সচেতন ভাবে দুঃখবাদী বলে হয়তো নিজেকে তিনি প্রমাণিত করতে চেয়েছেন, কিন্তু আপন স্বভাবস্থ দুঃখের অন্তরালস্থিত রোমান্টিক প্রত্যয়কে নাকচ করতে পারেননি চেষ্টা করেও; আবার রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রানুসারীদের প্রতিক্রিয়াতেই তাঁর বিশিষ্ট কবি-প্রত্যয়ের উদ্ভব বলে তাঁর ও সমালোচকদের বিশ্বাস সত্ত্বেও তাঁর কবিপ্রত্যয়ের উৎস ভিন্নতর বলেই আমাদের বিশ্বাস। রবীন্দ্র প্রতিক্রিয়ায় কেন তাঁর কাব্য-প্রত্যয়ের জন্ম নয় তার কথা আগে বলেছি। এবং রবীন্দ্রানুসারীদের প্রতিক্রিয়াতে যে এমন দীপ্ত অকপট কাব্য সৃষ্টি সম্ভব নয়, তার ইঙ্গিতও দিয়েছি। অতএব তাঁর কাব্য-প্রত্যয়ের উৎস অন্যস্থানে অনুসন্ধেয়।

এখানে একটি কথা পরিষ্কার করে নিই। আমরা আগেই সিদ্ধান্ত করেছি কবি প্রকৃত পক্ষে দুঃখবাদী বা জড়বাদী নন; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে মানুষ যে দুঃখ-যন্ত্রণা পায়, তা কাল্পনিক মায়ামাত্র, এমন বিশ্বাসে কবি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। আমাদের বলবার উদ্দেশ্য, জগতের কেন্দ্রীয় সত্যরূপে সুখ বা আনন্দের স্বীকৃতিই কবির অবচেতন মানসে প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু প্রাকৃতিক নানা কারণের ফলে সেই সুখ-পরিণতি দুঃখের দ্বারা আচ্ছাদিত বলে কবির যন্ত্রণা এবং সেই যন্ত্রণাকে কাব্যাঙ্গিকে ব্যক্ত করবার প্রচেষ্টা; দুঃখের আচ্ছাদনের ভিতর দিয়েও যে সুখের আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়, এ-সত্য প্রথম জীবনে কবির দৃষ্টিতে উপেক্ষিত। কবির যন্ত্রণা এবং এই দৃষ্টি বৈশিষ্ট্যের কারণ নির্ণয়ই আমাদের বর্তমান লক্ষ্য।

শ্রদ্ধেয় ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের মতে কবির নৈরাশ্যবাদের অন্যতম কারণ তাঁর বাল্যাবধি শারীরিক অসুস্থতা। কবি প্রথম জীবনে নানা কঠিন রোগে ভুগেছেন; ম্যালেরিয়া তাঁর বহুদিনের নিত্য সহচর; টাইফয়েড প্লেগ জাতীয় রোগও তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে। তা ছাড়া খুব বেশী না হলেও কিছুটা দারিদ্র্যের চাপও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। এর উপর ছিল পরবর্তী চাকুরিজীবনের নানা বিড়ম্বনা ও আশানুরূপ ফললাভে নৈরাশ্য। ব্যক্তিগত জীবনের এই অসুস্থতা, মধ্যবিত্ত জীবনের অস্বাচ্ছল্য ও চাকরীজীবনের নৈরাশ্য কবিমানসের দুঃখ চেতনার কিছুটা ইন্ধন। কিন্তু আবার ডঃ দাশগুপ্তের মতে, তাঁর কবিকর্ম ও কবিধর্ম সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাধিত মনের প্রতিক্রিয়ামাত্র নয়, শুধুমাত্র পারিবারিক দুঃখ-অস্বাচ্ছন্দ্যের দ্বারাও গঠিত নয়। আমরা এ বিষয়ে

ডঃ দাশগুপ্তের সঙ্গে একমত। কারণ, (কারণটি আমাদের নির্দেশিত) যদি স্বকীয় অসুস্থ ও অসচ্ছল মানসিকতা এই চেতনার মূলে থাকতো, তা হলে কবিতাগুলি এত জীবনরসপূর্ণ, প্রাণাবেগসমন্বিত বলিষ্ঠ দীপ্ত হতে পারতো না। সুতরাং এর কারণ আরও গভীরে। (ডঃ দাশগুপ্তের মন্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়। ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২১৭—২২৬)।

কোন বৈশিষ্ট্য বা বক্তব্য যখন জীবনসত্য বা জীবনভঙ্গিরূপে ব্যক্তিমানসে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তার পিছনে দুটি কারণের যে কোন একটি থাকতে পারে বা কারণ দুটি সমন্বিত ভাবে থাকতে পারে। একদিকে পুরুষানুক্রমিক বৈশিষ্ট্য (hereditary characteristics) যেমন তার ব্যক্তিমানসের অন্যতম সংগঠক শক্তি, অপরদিকে তেমনি পরিবেশ থেকে আহৃত সমকালীন বিশিষ্ট গতি-প্রকৃতিও (acquired characteristics) তার বৈশিষ্ট্যের নিয়ামক। এখানে আমি ঐতিহ্যগত heredity এবং সমকালীন যুগাগত acquired বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে চাই। যতীন সেনগুপ্তের মধ্যে যতটুকু দুঃখ-চেতনা তা এই দুই চেতনার সমন্বিত ফলশ্রুতি, কিন্তু কোন রবীন্দ্রবিরোধী প্রতিক্রিয়ায় নয়, এটাই আমাদের বক্তব্য।

প্রথমে পুরুষানুক্রমিক বা ঐতিহ্য-আগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা। ভারতীয় চেতনায় যেমন আনন্দবাদের প্রতিষ্ঠা, তেমন দুঃখবাদের প্রতিষ্ঠাও কিছু কম নয়। উপনিষদে বলা হয়েছে, 'আনন্দ থেকেই প্রাণীবর্গের সৃষ্টি'। তেমনি আবার সাংখ্য দর্শনে জড়বাদের প্রতিষ্ঠা এবং বৌদ্ধ দর্শনের অন্যতম মূল বক্তব্য, 'জন্মগ্রহণের অবশ্যম্ভাবী ফল মৃত্যু এবং তার সঙ্গে বিজড়িত অন্যান্য অশুভ যথা মনস্তাপ ও শোক, দুঃখভোগ ও দুর্ভাবনা, বিষাদ এবং হতাশা। দার্শনিকশ্রেষ্ঠ শঙ্করাচার্যও সর্বপ্রকার কামনাকে দুঃখের কারণ ও এ-জীবন দুঃখপূর্ণ, এ সিদ্ধান্তেই শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ এই সকল দর্শন ও দার্শনিকের মতে জীবদেহ ধারণ করলে দুঃখ থেকে পরিত্রাণের উপায় নেই। দুঃখই জীবের উৎস, দুঃখেই তার প্রতিষ্ঠা এবং দুঃখের ফলেই তার মৃত্যু—এই জীবনদর্শন বহু বৎসর ধরে ভারতীয় চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং এর ফলে ভারতীয় হিন্দু বহুদিন ধরে এক জীবন-বিমুখ জীবন ধারণ করেছে; ও এই পৃথিবীকে অস্বীকার, জীবন ও পরিবেশের রূপ রস আনন্দের দিকে বিমুখদৃষ্টি হয়ে কোন এক অর্থহীন মুমুক্ষার কামনা করেছে। সুতরাং ভারতীয় যে-কোন

কবির দুঃখচেতনার উৎস অনুসন্ধানের জন্য বেশীদূর যাওয়ার দরকার নেই। ভারতীয় কবি যতীন্দ্র-মানসে এই চেতনা যে উক্ত ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হয়ে যায়নি এমন কথা বলা অহংকার মাত্র।

উনবিংশ শতকীয় জীবনবাদ এই নৈরাশ্য চেতনার প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে শেষ পর্যন্ত এই জীবনবাদের তথা আনন্দবাদের প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্র-সমকালেই আবার এই আনন্দবাদের দিকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন এবং নূতনভাবে দুঃখ চেতনার জয়গান। দুটি সমকালীন কারণ এর মূলে। একটি বৈজ্ঞানিক ও অপরটি সামাজিক। কিংবা বলা যায় সামাজিক কারণটি বৈজ্ঞানিক কারণটিরই পরিণতি।

সমকালে যে কয়টি চিন্তা পৃথিবীর সভ্য সমাজকে সর্বাপেক্ষা বেশী নাড়া দিয়েছে, তার দর্শনচিন্তাকে তীব্রভাবে প্রভাবান্বিত করেছে এবং সমাজ-মানসিকতাকে আলোড়িত করেছে, তার মধ্যে প্রধানতম বৈজ্ঞানিক চার্লস ডারউইনের 'Origin of Species' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত বিবর্তনবাদ। বইটির প্রথম প্রকাশ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে। ডারউইয়ের বক্তব্য অনুসারে সমস্ত জৈবজগৎ বিবর্তিত হতে হতে চলেছে। যে কোন বিশেষ শ্রেণীস্থ প্রাণীর সার্থকতা পরবর্তী পরিণততর প্রাণীর উদ্ভবের ভিত্তি হয়ে ওঠাতে। তার নিজের জীবনের অন্য কোন পরমার্থতা, অন্য কোন সার্থকতা নেই। সে যেন বিশেষ কোন প্রাকৃতিক উদ্দেশ্য-অভিব্যক্তির সোপান মাত্র। নিজের দিক দিয়ে তার জীবন অর্থহীন, পরিণামহীন। নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পরবর্তীর অগ্রগতি সৃষ্টিতেই তার সকল পরিসমাপ্তি।

ডারউইনের এই বিবর্তন চেতনা যেমন একদিকে য়ুরোপীয় গতিমূলক দর্শনকে স্পেনসার, বার্গসঁ, মর্গান, আলেকজাণ্ডার প্রভৃতির মধ্যদিয়ে নূতনভাবে অনুপ্রাণিত করেছে, তেমনি আবার সাহিত্যের মধ্যে এই দর্শন নূতন নূতন ভাবচিন্তার উদ্রেক করেছে। সারা পৃথিবীর সাহিত্যিকদের সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্যিকরাও এই চিন্তা-চেতনাকে সরিয়ে রাখতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যের অন্তরালে যেমন এই গতি-দর্শনকে অস্বীকার করা যায় না, তেমনি আমাদের মতে যতীন্দ্র সেনগুপ্তের দুঃখ-চেতনার মূল নিয়ন্ত্রক শক্তিও এই ডারউইনের বিবর্তনবাদ। কবির কাব্যে তার বহু উদাহরণ ছড়ান আছে। কবির এই চেতনাকে বলা যেতে পারে তাঁর প্রকৃতিবাদ। প্রকৃতির যান্ত্রিক নিয়মানুগত্য ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন মানুষের পক্ষে অসহনীয়। এই

অসহনীয় যান্ত্রিকতাই কবির নৈরাশ্যবোধের স্রষ্টা। এই যান্ত্রিকতা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে নিজের ইচ্ছানুরূপ প্রকৃতিস্থ ইচ্ছাজগৎকে খুঁজে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা, সেই জগতে প্রত্যয়, এবং তাকে না পাওয়ার বেদনার দ্বান্দ্বিক ফলশ্রুতিরূপে প্রকাশিত কবির তথাকথিত দুঃখবাদ। কবির কাব্য থেকে এর কিছু পরিচয় দেওয়া যাক।

এই যান্ত্রিক নিয়মানুসারে কেবলই হয়ে ওঠাই (becoming) আমাদের নিয়তি, কিন্তু তা কোন গন্তব্যের সার্থকতায় পৌছনোর জন্ম নয়। এই গতিই আমাদের জীবন। তারপর একদিন প্রাকৃতিক ক্ষয়ক্ষতি (wear and tear) অনুসারে মৃত্যু আসে এবং তখন নির্দয় মূল্যহীনতায় প্রাকৃতিক কণ্টকবনে আমাদের শেষ আশ্রয় লাভ। প্রাকৃতিক নানা উত্তেজনায় আবার পারস্পরিক কলহ, সংগ্রাম। একজনের দ্বারা অপরকে ধ্বংস করবার কত কলা-কৌশল। কত আকাঙ্ক্ষা-প্রচেষ্টা সাধনা দিয়ে যে জীবন-রচনা তার এই পরিণতি অসহনীয়, অবিশ্বাস্যও বটে। এরই যন্ত্রণাদায়ক তুলনা রচনা লাটিমের ব্যঞ্জনার মধ্যে,—

ছেলেরা লাট্টু খেলে,
লেতিতে জড়ায়ে মুঠায় ঘুরায়ে বোঁও ক'রে ছুঁড়ে ফেলে।
বন্-বন্-বন্ ঘুর-ঘুর-পাক চিতেন কেতেন সোজা;
লাট্টু বলিছে, 'হায় হায় হায়! ঘুরে ঘুরে কারে খোঁজা!
জীবন যে আসে ফুরায়ে',—
বলিতে বলিতে ফুরালো ঘুরন—বালক লইল কুড়ায়ে।
আবার লেতিতে জড়ায়ে লাট্টু গপ্‌চা মারিয়া ফেলে,
একটার ঘায়ে অন্যে ফাটায়ে ছেলেরা লাট্টু খেলে।
দেখিনু দাঁড়ায়ে কোণে,—
ফাটা লাট্টুটা ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে কণ্টকবনে।

(ঘুমের ঘোরে/১ম ঝোঁক)

প্রকৃতি মায়ের বুকে স্নেহ সঞ্চার করে, সেই স্নেহ আবার বুকের অমৃতহয়ে ওঠে সন্তানের জন্ম, আর কোলে দেয় সন্তান। মা যখন সকল হৃদয়-উত্তাপ আর কঠোর শ্রম দিয়ে নিজেরই রক্ত থেকে জাত সন্তানকে বড় করে তোলে, তখন হয়ত প্রকৃতি কোন অলক্ষ্য নিয়তির রূপ ধরে মায়ের কোল থেকে সন্তানকে

কেড়ে নেয়; যেন সন্তান মায়ের সামগ্রী নয়, যেন মাতা ধাত্রী মাত্র। কবির কাছে প্রকৃতির এই বৈশিষ্ট্য অত্যাচারীর এক রূপান্তর মাত্র,—

চিতার বহ্নি যত বিধবার সিঁথার সিঁদুর চেটে
বিশ্বম্ভর হে গণেশবর, জোগায় তোমারি পেটে!
গোরু-পোষানির প্রায়—
জননীর কোলে ছেলে বড় ক'রে কে পুনঃ কাড়িছে হায়!

(ঘুমের ঘোরে/২য় ঝোঁক)

জীবনের অর্থহীন গন্তব্যহীন যান্ত্রিকতার কথা বার বার কবির 'ঘুমের ঘোরে' কবিতাটিতে,—

(১) সব হয়ে যায় বৃথা,
আসে, হাসে, কাঁদে, চ'লে যায় ঘুরে বায়োস্কোপের ফিতা।

(ঘুমের ঘোরে/২য় ঝোঁক)

(২) এ কথা বুঝিব কবে—
ধান ভানা ছাড়া কোন উঁচু মানে থাকে না ঢেঁকির রবে!

(ঐ/৪র্থ ঝোক)

একজনের মৃত্যু পরবর্তীর ভূমিকা, একজনের জীবন বিবর্তন-ধারাপথে অপর স্তরে পৌঁছোনোর সোপান মাত্র; এ-ছাড়া বিবর্তনচেতনা জীবনের অধিক কোন সার্থকতা স্বীকার করে না। কবির কাব্যেও তার বেদনামণ্ডিত স্বীকৃতি,—

(১) দহিলে আপন রূপ
কোন অজানার পূজা-উপচারে অমল গন্ধধূপ!

(ঐ/৪র্থ ঝোঁক)

(২) ভরেছ আতরদানি,
কত প্রভাতের আধফোটা ফুল-মর্ম নিঙাড়ি' ছানি?
কণ্ঠে দুলালে মিলন-মালিকা নব সুগন্ধ ঢালা—
সন্তছিন্ন শিশু-কুসুমের কচি মুণ্ডের মালা!

(ঐ/৩য় ঝোঁক)

বিবর্তনের এই অন্ধ যান্ত্রিকতা থেকে কোনদিন ছুটি নেই। অনন্তকাল ধরে এই চলতে থাকবে। নিরবধি কাল আর বিপুল বিশ্ব বিস্তৃত করে বিবর্তনের এই অন্ধধারার সম্প্রসার,—

যুগযুগান্ত ভ্রমণক্লান্ত নিশ্চল কত গতি,
ফাঁকি খুজে কত মহতপনের নিবিল আঁখির জ্যোতি!
তবু কারো নাই ছুটি
অভ্যাস ঘোরে হাতাড়িয়া মরে আঁধারেতে মাথা কুটি।
অসীমের কারাগার,—
যত যেতে চাও তত যাও, শুধু বেড়ার মেলেনা পার।

(ঘুমের ঘোরে/ঘুম ঝোঁক)

শুধু বিশ্বজাগতিক ক্ষেত্রে নয়, ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন পর্যায়-পরম্পরার মধ্যেও ঐ একই পরিণতিহীন বিবর্তনবাদের যন্ত্রণা-চিহ্নিত স্বীকৃতি,—

ও ভাই কর্মকার,—
আমারে পুড়িয়ে পিটানো ছাড়া কি নাহিক কর্ম আর?

রাত্রি দু'পরে মনে নাহি পড়ে কি ছিলাম আমি ভোরে,
ভাঙিলে গড়িলে সিধা বাঁকা গোল লম্বা চোকা ক'রে;
কভু আতপ্ত কভু লাল, কভু উজ্জ্বল রবিসম,
কভু বা সলিলে করিলে শীতল অসহ্য দাহ মম।
অজানা দুজনে গলায়ে আগুনে জুড়িয়া মিটালে সাধ,
ধড় হ'তে কভু বাহুল্যবোধে মাথা কেটে দিলে বাদ।
ঘন ঘন ঘন পরিবর্তনে আপনা চিনিতে নারি,
স্থির হয়ে যাই ভাবিবার চাই, পড়ে হাতুড়ির বাড়ি।

(লোহার ব্যথা/মরুশিখা)

প্রকৃতি-জগতে মানুষ এক অভিনব প্রাণী। যান্ত্রিক বিশ্বজগতে মানুষ তার প্রেম-প্রীতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, চেতনা-আবেগ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিয়ে সম্পূর্ণ নবাগত। কিন্তু যেহেতু সে এই প্রকৃতি-জগৎ থেকেই উদ্ভূত, এই প্রকৃতি

জগতের মধ্যেই উপরিউক্ত মানবিক বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই অন্তর্লীন হয়ে আছে। অথচ প্রকৃতি জগতে জড়েরই আধিপত্য এবং মানবিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি প্রকৃতি-জগৎ আপাত উদাসীন। তাই মানুষ প্রতিমুহূর্তে তার সকল বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকৃতির জড়ত্ব দ্বারা অপমানিত। কিন্তু যে প্রকৃতি বিবর্তনের পথে মানুষের স্রষ্টা, মানুষের প্রতি তার এই বিমুখতা ব্যাখ্যাতীত। তথাকথিত দুঃখবাদের মধ্য দিয়ে আসলে কবির প্রকৃতির এই ব্যবহার-বৈশিষ্ট্যের প্রতি প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ।

বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রকৃতিজগৎ সম্পর্কে কবির যে বক্তব্য, সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে কবির সেই একই অভিযোগ। যে সমাজ ও রাষ্ট্র সভ্যতা-সচেতন মানবসমষ্টির সৃষ্টি, কালক্রমে সেই সমাজ ও রাষ্ট্রও জড় যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় এবং মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপোষক ও তাকে পূর্ণ করবার মাধ্যম না-হয়ে মানুষের অত্যাচারী প্রভু হয়ে দাঁড়ায়। এই সমাজ ও রাষ্ট্রের যাঁরা কর্তা ও পরিচালক তাঁরা অধিকার করেন শোষকের স্থান। যতীন্দ্রনাথের কাব্য সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে মানুষের উপর মানুষের এই অত্যাচারের জন্য ব্যথিত ও প্রতিবাদমুখর। তাঁর দুঃখবাদ এই সামাজিক অন্যায়েরও প্রতিবাদ বটে। আসলে সকল প্রকৃত কবির মত তাঁর কাব্যজীবনের মূল কেন্দ্রে আছে মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা এবং সর্বপ্রকার শাসন-শোষণ মুক্ত আনন্দময় মনুষ্যপ্রতিমা দেখার গভীর আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা যেখানে অপূর্ণ সেখানেই কবির কাব্যিক প্রতিবাদ, বাহ্যত যা তাঁর তথাকথিত দুঃখবাদ। এই মানবতাই কবির ভাবপ্রত্যয়ের মূল প্রেরণা এবং কাব্যের রূপকল্পরচনার প্রধান নিয়ামক। কবির কাব্য থেকে কবির এই মানবতার পরিচয় উদ্ধার করা যাক,—

(১) কোথা হ'তে তুমি এলে গো লক্ষ্মি! কোথা ছিলে এতদিন?
আমার প্রমোদ-ভবনের তরে কারা হ'ল ভিটাহীন?
আমার দীপালি রাতি,
উজ্জ্বল আজি কত না জীবের নিবায়ে জীবন বাতি!
(ঘুমের ঘোরে / ওয় কৌক)

(২) দেখিনু তন্দ্রাভরে—
তাঁতীর টাকার বড় দরকার, মাকু ছুটাছুটি করে। (ঐ)

(৩) বাদল-সাঁঝের বেদন-ভরা বাঁশবাগানের তরুণ বাঁশই
গোটাকতক ছ্যাঁকায় ভুলে হ'ল ডোমের মুখের বাঁশী!
(বাঁশীর গল্প / মরুশিখা)

(৪) কামাইয়া নির্মোক—
কত-না যতনে কাটারির হুলে কেটে আঁকে দুটি চোখ।
কণ্ঠে ঠুকিয়া নলি,
খেজুর-পাতার ফাঁস ক'রে ভাঁড় বেঁধে দিল গলাগলি।
সেদিন হইতে খেজুর-বাগানে নীরবে অনর্গল
সারারাত ধরে খেজুর গাছের দুই চোখে ঝরে জল!
সিউলিরা ভোরে সংগ্রহ করে ভাঁড় ভরা মিঠে রস,
দিক হতে দিকে ছড়ায়ে পড়িল খেজুর গাছের যশ।
(খেজুর-বাগান/ঐ)

(৫) সার্থক তোরা ফুলকলি ;
আপনার হাতে ছিঁড়ে মালা গাঁথে
প্রিয়া মোর গলে দিবে বলি'।
কান্না কিসের ভাই?
মোদের মিলনে গন্ধ মিলাবে—
এতেও তৃপ্তি নাই? (সার্থক/মরীচিকা)

(৬) বিষ্ণুশর্মা কহে মারি' বেত্‌—
'গণস্যাগ্রে ন হি গচ্ছেৎ' ;
গণতন্ত্রীয় এ মূলমন্ত্রে
পিছু হ'তে ঘাড় মটকাই।
কার ঘাড়?······ড্যাম্‌ ডট্ ভাই।
পিছু হট্ পিছু হট্ ভাই॥ (পিছু হটার গান/মরুমায়া)

উদাহরণগুলিতে মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচার দর্শনে কবির তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-কটাক্ষ। একজন মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি সাধনের জন্য সহস্র মানুষের ক্রীতদাসত্ব ; লক্ষ মানুষের অস্থি-মজ্জার উপর গড়ে ওঠে সভ্যতার বনিয়াদ। যারা জীবন দিয়ে অপরের গজদন্তমিনারের সুখ-বিলাস গড়ে তোলে তাদের

শুধু জোটে ফাঁকা প্রশংসার বাণী। এ-প্রশংসাও আন্তরিক নয়, এও মানুষকে দিয়ে ক্রীতদাসত্ব করিয়ে নেওয়ার এক মাদক ঔষধ মাত্র। একজনের প্রাসাদ নির্মাণের স্থান ও অর্থ যোগাতে কত লোক যে গৃহহীন হয়, মাকুর মতই কতনা মানুষ ছুটোছুটি করে, নিজেদের দুঃখ লাঘবের জন্য নয়, তার কর্তা তাঁতীর (অর্থাৎ সেইসব ধনিক শোষকের যারা তাদের পরিচালক) সমৃদ্ধি স্তূপীকৃত করে তুলবার জন্য। বাঁশীর মুখ দিয়ে সুরমাধুর্য নির্গত হয়, কিন্তু কোন বেদনার তাপে তার এই সুরপ্রবাহ-সৃষ্টি কে তার খবর রাখে? বাঁশকে বাঁশী করতে তার বুকে দিতে হয় তপ্ত ছ্যাঁকা। সাহিত্যে ট্রাজেডির নায়ক পায় সার্থক অভিনন্দন। কিন্তু তা সম্ভব হয় সর্বশূন্যতার হাহাকার তার বুকে সঞ্চারিত হলে। অপরের আনন্দবিধানের জন্য এই বেদনার রক্তাক্ত স্বাক্ষর বহন করে চলে কত মানুষ। খেজুর গাছের কণ্ঠে ছিদ্র করে বের করে আনা হয় তার জীবন-প্রবাহ থেকে তৈরি মাধুর্য-রস। খেজুর গাছও সেই মানুষেরই প্রতিনিধি যারা আপন দুঃখ-যন্ত্রণাকে অপরের আনন্দরূপ পাথেয়ে পরিণত করে উপহার দিচ্ছে সভ্যতার বেদীমূলে। ফুলগাছ থেকে ছিঁড়ে আনা ফুলের মুকুলে তৈরি হয় নবদম্পতির মিলন-মালিকা। তেমনি কত মানুষের জীবনকে আনন্দপূর্ণ করতে অপর কত মানুষই না ছিন্নমূল; আপন মাতৃভূমি, নিজের প্রকৃত পরিবেশ ও দেশ, নিজের প্রিয়জনের কাছ থেকে উৎপাটিত। কবির মানবিকতা এদের বেদনাকে ভাষা দিয়েছে। এদের যারা শোষণ (exploit) করছে, গণদেবতার দোহাই দিয়ে গণমানুষেরই ঘাড় মটকাচ্ছে, তাদের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ-কটাক্ষ প্রযুক্ত হয়েছে তাঁর প্রায় সমস্ত কাব্যে। যে আনন্দ ও সুখে সকলেরই অধিকার, যে মুক্তি সকলের জন্মগত প্রাপ্য, তার থেকে মানুষের বঞ্চনাই কবির দুঃখবাদের উৎস। কবির এই দুঃখবাদের মূলভিত্তিগত সত্যোপলব্ধি—

> শুনহ মানুষ ভাই!
> সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা আছে বা নাই!
> যদিও তোমারে ঘেরিয়া রয়েছে মৃত্যুর মহারাত্রি,
> সৃষ্টির মাঝে তুমিই সৃষ্টি-ছাড়া দুখ-পথ-যাত্রী!
>
> (দুঃখবাদী/মরুশিখা)

সুতরাং এখন আমরা এ-সিদ্ধান্ত করতে পারি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রানুসারীদের বিলাসবাদের প্রতিক্রিয়ায় নয়, কবির নিজস্ব আন্তর সত্যোপলব্ধিই কবির বিশিষ্ট

জীবন-দর্শনের উৎস। এই উপলব্ধি কবির ঐতিহ্য-চেতনা এবং সমকালীন বৈজ্ঞানিক দার্শনিক চেতনা ও সমাজ-চেতনার সম্মিলিত ফলশ্রুতি।

এবং ভাবগত দিক দিয়ে কিছুটা ঋণ হয়তো পূর্বতন কবিদের কাছেও ছিল। রবীন্দ্রনাথকে যতই সুখবিলাসী আনন্দবিলাসী বলে অভিযুক্ত করা যাক, তাঁরও কাব্যের মূলভিত্তি মানবতা, তাঁরও জীবন ও কাব্যের কেন্দ্রে মানুষ। প্রাক্-যতীন্দ্র রবীন্দ্রকাব্যের এই মানবচেতনার পরিচয় এই গ্রন্থের পরবর্তী প্রবন্ধ 'বলাকা—কাব্য, কবি ও তত্ত্বে' আমরা দিয়েছি। যতীন্দ্রপূর্ব সত্যেন্দ্রনাথেও এর পরিচয় দুর্লভ নয়। সত্যেন্দ্র আলোচনায় আমরা তাও দেখিয়েছি। এঁদেরই উত্তরসূরী যতীন্দ্রনাথের কবি-চেতনায় এঁদের এই ভাব-চিন্তা যে কোন ভাবেই সঞ্চারিত হয়ে যায়নি, এ-কথা বলা কিছুটা মূঢ়তা বৈকি। আপাত যাদের ব্যঙ্গ করতে কবি চেয়েছিলেন, তাদের কারো কারো প্রভাব কবির কাব্যে কখন অনঙ্গ হয়ে মিশ্রিত হয়ে গেছে, কবি নিজেই তা খেয়াল করতে পারেননি। কবির সচেতন মনে যখন রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকৃতির প্রয়াস, অবচেতন মনে তখন তাঁর কাছ থেকেই প্রেরণা-গ্রহণ

বলাকা—কাব্য, কবি ও তত্ত্ব

[এক]

কাব্য : সৌন্দর্যসত্তা

'কলাকৈবল্যবাদ' বা 'Art's for art's sake'-এর সমর্থক অনেকে থাকলেও সার্থক সাহিত্যের অন্তরে জীবনসত্যের প্রকাশ থাকতে বাধ্য। জীবন ও জগতের সত্যকে রসানুভূতির মধ্য দিয়ে সার্বজনীনতা দানই সাহিত্যের লক্ষ্য। আর তার জন্যই সার্থক সাহিত্য প্রেয়োচেতনার সঙ্গে শ্রেয়োবোধের মিলনের ফলশ্রুতি। কিন্তু এই জীবনসত্য বা শ্রেয়ো-চেতনা উদ্যতমুখ প্রচার-সর্বস্বতা বা উপদেশরূপে দেখা দিলেই আপত্তি এবং সেখানেই লেখকের অক্ষমতা। প্রকৃত সাহিত্যিক বিশিষ্ট জীবনদর্শনের কেন্দ্রীয় তত্ত্ব কঙ্কালকে রসলাবণ্যস্পর্শে সৌন্দর্য-মূর্তি দান করেন। অন্যথায় তাঁর রচনা দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, সাহিত্য নয়।

শব্দ ও অর্থের সার্থক ও ব্যঞ্জনাময় সহিতত্বে রচিত রচনা যখন আমাদের সৌন্দর্য-বোধকে উদ্বোধিত করে, আমাদের অন্তরে ভূমার আনন্দ সঞ্চার করে, মানুষের জগৎ ও বিশ্বজগতের সঙ্গে আমাদের সাধারণীকৃত (universalised) করে, আমাদের সঙ্কীর্ণ-ব্যক্তিত্ব-পরিচ্ছিন্ন অহংবোধের প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়ে বাইরের বিপুলতার সঙ্গে একাত্ম করে,— তখনই বলি কাব্য সৃষ্টি হয়েছে। তখন তার অন্তরে যে তত্ত্ব, যে দর্শনই থাক না কেন, তাকে সাহিত্য বলে গ্রহণ করতে আর কোন বাধা থাকে না। তখন সেই তত্ত্ব বা দর্শনকে শুধু জ্ঞানে জানিনা, অনুভূতিতে উপলব্ধি করি। তখন সেই তত্ত্ব আমার ব্যক্তিত্বের বাইরে অবস্থিত তন্ময় (objective) জ্ঞানের সামগ্রী মাত্র নয়, তখন তা আমার চেতনার সঙ্গে একাত্ম মন্ময় (subjective) আত্মোপলব্ধি। এবং তখনই তা রসনিষ্পত্তি বা আনন্দের উদ্বোধনে সার্থক সাহিত্য-পদবাচ্য।

রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' গ্রন্থ তত্ত্বাশ্রয়ী এ-কথা অনস্বীকার্য। গতিতত্ত্ব, বিপ্লব-চেতনা, নবীন-বরণ ও মানব-শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়বাহী এই রচনাখানি প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য, প্রাচীন-সাম্প্রতিক, দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক, রাষ্ট্রীয়-মানবিক চেতনার এক তাত্ত্বিক পরিচয় নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে। জীবনসত্যের পূজারী কবি জীবনের গভীর অর্থ আবিষ্কার ও প্রকাশ করেছেন এই কাব্যে।

ভারতীয় উপনিষদ, পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক বার্গসঁর প্রাণ-প্রেরণা (Elan vital)-কেন্দ্রিক গতিতত্ত্ব, বৈজ্ঞানিক ডারউইনের বিবর্তন-চেতনা, সমকালীন রাষ্ট্রনীতিক লোভ-উন্মত্ততার বিরুদ্ধে ধিক্কার, দর্শন-বিজ্ঞান-মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা, প্রভৃতি নানা বিষয়ের প্রতিফলন দেখেছেন এই কাব্যে সাহিত্য-ব্যাখ্যাতাগণ। কিন্তু এই সমস্ত গভীর ও জটিল বক্তব্যগুলি অশোধিত (crude) তত্ত্বরূপে উপস্থাপিত হয়নি। পক্ষান্তরে বিভিন্ন কবিতার মধ্য দিয়ে যখন তারা প্রকাশিত হয়েছে, তখন তারা রূপে রসে ঝলমল করে উঠেছে। আর তার ফলেই তারা কাব্যত্ব পেয়েছে। তত্ত্বের কঙ্কাল কাব্যের রসলাবণ্যে অপূর্বসুন্দর রসমূর্তি পরিগ্রহ করেছে; তারা তখন কেবলমাত্র আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারে রসদই জোগায়নি, আমাদের আনন্দিত করেছে, আমাদের সামনে রসলাবণ্যময় সৌন্দর্য অভিব্যক্ত করেছে।

কাব্য দুই শ্রেণীর—দ্রুতি ও দীপ্তি। দ্রুতি কাব্য রসের দ্রাবনে আমাদের দ্রব করে। রস অর্থাৎ আনন্দের মধ্যে আমরা আত্মনিমজ্জন করি, সৌন্দর্যের সঙ্গে একাত্ম হই। দীপ্তি কাব্য আমাদের নব বোধে উদ্দীপ্ত করে, আমাদের সামনে জগৎ ও জীবনের কেন্দ্রীয় সত্যকে উন্মোচন (reveal) করে। এ সবই সম্ভব হয় কবির শিল্প-চেতনার দ্বারা। এই চেতনার ফলেই কাব্যে-সমর্পিত শব্দ, বাক্যাংশ ও বাক্য বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে ধ্বনিময়তা (undertone এবং morpheme) সৃষ্টি করে; ফলে, পরিবেশ দেশ ও কালের স্পর্শ-সৌরভ-সঞ্চারিত বিপুল দ্যোতনার সৃষ্টি হয়, আমাদের সামনে নূতন সৌন্দর্য জগতের উন্মোচন ঘটে।

বলাকা কাব্যে তাই-ই হয়েছে। কাব্যখানি তার শব্দসম্ভারের বাচ্যাতীত ধ্বনিময়তা, তার বৈদগ্ধ্য-ভঙ্গি-ভণিতি, তার ছন্দগতির প্রবহমানতার মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে অপূর্বপরিচিত এক সৌন্দর্য-বোধি-সর্বাতিশয়ী কাব্যের জগৎ উন্মোচিত করে দিয়েছে। এই সৌন্দর্য আমাদের আনন্দিত করেছে, এই বোধি আমাদের উদ্বোধিত করেছে, দীপ্ত করেছে, আমাদের কাছে জীবনের নূতন অর্থ সঞ্চার করেছে। আমরা বিপুল প্রকৃতি-জগৎ ও বিশাল মানব-জগতের সঙ্গে, তার সৌন্দর্য ও রস, আনন্দ ও বেদনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে, এই বিপুলতা ও বিশালতার সহিতত্ব লাভ করেছি। তত্ত্বের উৎসগুলি আমাদের অনুভূতি-উপলব্ধির সৌন্দর্য-জগতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমরা দর্শন ছাড়িয়ে সাহিত্যের আনন্দ লাভ করেছি।

উদাহরণে আসা যাক। এই গ্রন্থের 'বলাকা' কবিতাটি (৩৬ সংখ্যক) কবির বিশিষ্ট গতিচেতনার নির্যাসিত তত্ত্বরূপ। স্বল্পায়তন এই কবিতাটির মধ্যে অবিরাম গতির জয়গান ধ্বনিত। Becoming, কেবলি হয়ে চলা, কেবলই গমন—কিন্তু কোন নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে নয়, এটিই কবির মুখ্য বক্তব্য। আপাত স্তব্ধতার অন্তরালেও রয়েছে গতির কেন্দ্র, যা স্থিরত্বের মধ্যেও 'বেগের আবেগ' সৃষ্টি করেছে। এই দার্শনিক বক্তব্যই কাব্যে সমর্পিত হয়ে নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব-বৈশিষ্ট্য অতিক্রম ক'রে রস-সামগ্রী হ'য়ে উঠেছে। তার ফলে কবিতাটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপাভিব্যক্তি' লাভ করেছে।

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার ;
দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এলো তার ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে :
অন্ধকার গিরিতটতলে
দেওদার তরু সারে সারে ;
মনে হল, সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি—
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি।

সহসা শুনিনু সেইক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে।
হে হংস-বলাকা,
ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।

উপরিউক্ত কাব্যাংশটিতে যে স্ফূর্তি আছে, বর্ণনার মধ্যে যে রহস্যময়তা, বিস্ময় ও উদ্দীপনা আছে, এবং সবকিছু মিলিয়ে আশ্চর্য চিত্রধর্মিতা (suggestions এবং images) আছে, তার ফলে এটি একটি সার্থক শিল্পসত্তা

লাভ করেছে। আধ অন্ধকারে ঝিলমের বাঁকা স্রোতের খরদীপ্তি, গিরিতটোপরি সার সার স্তব্ধ দেওদার তরু এবং তার বৈপরীত্য (contrast) রূপে 'ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত' বকপাঁতির আকাশ পরিক্রমা,—এ ছবি অতুলনীয়। এরা তত্ত্বের স্থির জগতে আমাদের বদ্ধ থাকতে দেয় না, পক্ষান্তরে এই চিত্রকে অবলম্বন করে আমাদের বাসনালোকে একের পর এক চিত্রের তরঙ্গ উঠতে থাকে। আমরা এই জগতের সঙ্গে সহিতত্ত্ব লাভ করি। ঐ রস ও সৌন্দর্যময় প্রকৃতির মধ্যে নিজেদের সম্প্রসারিত করে দিই। আর কি অপূর্ব ব্যঞ্জনাবহ শব্দসম্ভার! 'দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার', 'এল তার ভেসে আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে', 'সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে', 'অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি,' 'শব্দের বিদ্যুৎছটা', 'ঝঞ্ঝামদরসেমত্ত তোমাদের পাখা' প্রভৃতি বাক্যাংশ বাচ্যার্থকে ছড়িয়ে অনেক দূর চলে গেছে, ব্যঞ্জনার অপূর্ব জগৎ উদ্‌ঘাটিত করেছে রেখায় রেখায়। ঝিলম নদী হয়েছে অন্ধকারের খাপে-ঢাকা তীক্ষ্মমুখ বাঁকা তলোয়ার, দিনরাত এক প্রবহমান নদী স্রোতের মত একই সঙ্গে নদী ও গতিকে করেছে অভিব্যক্ত, ঝিলমের কালো জলে তারাদের প্রতিবিম্ব যেন দিবারাত্রির তরঙ্গভঙ্গে ভাসিয়ে দেওয়া ফুলের মালা, অন্ধকারের আচ্ছন্নতায় প্রকৃতির অর্ধ-অবগুণ্ঠিত প্রকাশ যেন স্বপ্নের আবরণে সৃষ্টির অর্ধস্ফুট বাক্য-উচ্চার,—আপাত স্তব্ধ কিন্তু বাণীবহ। এর সৌন্দর্যময় কাব্যাত্মকতা তুলনাহীন। দ্রুতি এবং দীপ্তিতে, রসে এবং উপলব্ধিতে এ আমাদের অলৌকিক আনন্দের জগতে নিয়ে যায়। সারা কবিতাটির সর্বাঙ্গ ব্যাপ্ত ক'রে এই রসের ও দীপ্তির পরিচয়, কোন বিচ্ছিন্ন স্থানে এ পরিচ্ছিন্ন নয়।

তত্ত্বকে কেন্দ্রে রেখে এমনি কাব্যিক সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি রয়েছে বহু কবিতায়। মনে রাখা দরকার কোন কবিতাঅন্তর্গত বিচ্ছিন্ন চিত্রগুলি খণ্ডিত ভাবে যেমন কাব্যপরিচয়বাহী, তেমনি তারা আবার একটি অখণ্ড সামগ্রিকতায় সমন্বিত হয়ে একটি পরিপূর্ণ রসসত্যের প্রকাশক। অন্যান্য যে সকল তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা এমনি সার্থক কাব্যপরিচয়বাহী হয়ে উঠতে পেরেছে, তাদের মধ্যে 'ছবি' (৬ সংখ্যক) 'সাজাহান' (৭ সংখ্যক), 'চঞ্চলা (৮ সংখ্যক), 'ঝড়ের খেয়া' (৩৭ সংখ্যক) প্রভৃতি উল্লেখ্য।

ছবি কবিতায় একটি রেখাবদ্ধ ছবিকে কেন্দ্র করে কবির ভালবাসার পাত্রীকে স্মরণ এবং তার মধ্য দিয়ে স্তম্ভিত গতির উপলব্ধি। কবির গতিশীল

জীবন-চেতনার অন্তরে রয়েছে তার প্রেম-প্রেরণারূপ স্থির কেন্দ্রটি (source of potential energy)। এটি শুধু তত্ত্ব নয়, একটি রসউপলব্ধি—তাই তার প্রেরণার স্পর্শে কবি জীবনের নব নব রূপায়ন. এই জগতের নূতন নূতন চিত্রসঞ্চার, জীবন নূতন চেতনায় অর্থবহ, প্রকৃতি নব সৌন্দর্যে বিস্মৃত; ভালবাসার আলোকেই সব সৌন্দর্যের উন্মোচন—

মরি, মরি, সে আনন্দ থেমে যেত যদি
এই নদী
হারাত তরঙ্গবেগ,
এই মেঘ
মুছিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন।
তোমার চিকন
চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হতে যদি মিলাইত
তবে
একদিন কবে
চঞ্চল পবনে লীলায়িত
মর্মর মুখর ছায়া মাধবীবনের
হ'ত স্বপনের।

এটি যতটুকু তত্ত্ব, তার থেকে অনেক বেশী কাব্য। কারণ এ অনুভূতির ব্যাপার এবং চিত্রকল্পসমুদয়ের মধ্যে দিয়ে এর অভিব্যক্তি।

'সাজাহান' কবিতায় ব্যক্তি সত্তার চিরচঞ্চল গতিময়তার তত্ত্বকথা, কিন্তু কি ট্রাজিক বেদনা ও ধূসর বিষন্নতার কাব্যিক লাবণ্যেই না তার অভিব্যক্তি! সব কিছু ঐশ্বর্যের তুচ্ছ মূল্যহীনতা, বিপুল মোগল সাম্রাজ্যের বিশাল ধ্বংসাবশেষ, এমন একান্ত করে চাওয়ার কি রিক্ত পরিসমাপ্তি—কি করুণ ছেড়ে যাওয়া, আর তার পটভূমিকায় প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখবার, প্রেমের স্মরণ মন্দিরকে চিরন্তন করে ব্যক্তিসত্তার জয় ঘোষণার কি হাস্যকর প্রচেষ্টা। এই উপলব্ধির চিত্র-অনুভূতি-রস-বদ্ধ আশ্চর্য কাব্যিক রূপায়ণ আলোচ্য কবিতাটি। একদিকে ছবির পর ছবি, আশ্চর্য রূপময় কিন্তু অনিত্যতার গভীর বেদনায় নিষিক্ত—সৌন্দর্য ও বেদনার অপূর্ব সম্মিলন, আমাদের অনুভূতির কেন্দ্রে তার অতুলনীয় আবেদন, আবার অন্যদিকে সমস্ত

মনুষ্য-প্রচেষ্টার ট্র্যাজিক ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিসত্তার অন্তহীন গতি—এই দুইয়ের মিলনে আমাদের বোধিতে ও বুদ্ধিতে নবচেতনার উন্মেষ ও রসানুভূতির প্রতিষ্ঠা,—সম্মিলিত দ্রুতি ও দীপ্তি কাব্যের পরিচয়বাহী।

দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবীমঞ্জরী
যেইক্ষণে দেয় ভরি
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল,
বিদায় গোধূলি আসে ধূলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল।
সময় যে নাই;
আবার শিশির রাত্রে তাই
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোল' নব কুন্দরাজি
সাজাইতে হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি।
হায় রে হৃদয়,
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।
নাই নাই, নাই যে সময়।

এবং

সমাধি মন্দির
এক ঠাঁই রহে চিরস্থির;
ধরার ধূলায় থাকি
স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি।
জীবনেরে কে রাখিতে পারে?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।

'চঞ্চলা' কবিতাটি বিশ্ব-জাগতিক গতির তাত্ত্বিক রূপায়ণ। কিন্তু নদীর ও নারীর রূপকল্পে বিধৃত, সৌন্দর্য-অতিশায়ী কি অপূর্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্তমন্থনকারী চিত্রসমুদয়ের সমারোহ। একদিকে নদীর গতিতে অন্তরের

গতিময় আনন্দউদ্বেলতা, অপরদিকে নদী ও নারী কেন্দ্রিক অসংখ্য চিত্র-সমুদয়ের রসতরঙ্গে আত্মনিমজ্জন। সর্বাপেক্ষা কাব্যসৌন্দর্য-সঞ্চারী চঞ্চলার সেই অভিসারের নিরুদ্দেশ যাত্রা—ঋতুর পুষ্পথালি হাতে উড্ডীন-অঞ্চল এলোকেশী সৌন্দর্য-তিলোত্তমা, বৈরাগিনী,—অভিসারের চঞ্চলতায় বক্ষের মণিহারের দ্যুতি-বিচ্ছুরণ, কর্ণাভরণের বিদ্যুৎ-বিকাশ, যাত্রার আনন্দবেগে সকল পাথেয় ক্ষয়কারী নারীসত্তা—

হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিনী,
চলেছে যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিণী,
শব্দহীন সুর
অন্তহীন দূর
তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া ?
সর্বনাশা প্রেম তার, নিত্য তাই তুমি ঘরছাড়া।
উন্মত্ত সে অভিসারে
তব বক্ষোহারে
ঘন ঘন লাগে দোলা—ছড়ায় অমনি
নক্ষত্রের মণি ;
আঁধারিয়া ওড়ে শূন্যে ঝোড়ো এলোচুল ;
দুলে ওঠে বিদ্যুতের দুল ;
অঞ্চল আকুল
গড়ায় কম্পিত তৃণে,
চঞ্চল পল্লবপুঞ্জে বিপিনে বিপিনে ;
বারম্বার ঝরে ঝরে পড়ে ফুল
জুঁই চাপা বকুল পারুল
পথে পথে
তোমার ঋতুর থালি হতে।
শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও ;
ফিরে নাহি চাও,
যা-কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।

কুড়ায়ে লও না কিছু, কর না সঞ্চয় ;
নাই শোক নাই ভয়,
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়।

'ঝড়ের খেয়া' কবিতার বিপ্লব-চেতনার সঙ্গে মিশ্রিত তরঙ্গ-স্তনিত, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উপর খেয়া পারাপারের ভয়কম্পিত দৃশ্য, মাতা ও প্রেয়সীর অশ্রুসিক্ত গৃহ তোরণ দিয়ে মেঘ-গর্জ্জিত, বিদ্যুৎবিদ্ধ আকাশ-তলে 'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার' লক্ষ্য করে পথিকের মহাপ্রয়াণ, বিপ্লবের বিপুল চেতনার কি রস-সমারোহ, বিপ্লবের কেন্দ্রে কি অকুতোভয় উদ্দীপ্ত আহ্বানের কাব্যিক উন্মাদনা,—

দূর হতে কী শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন
ওরে উদাসীন—
ওই ক্রন্দনের কলরোল,
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল।
বহ্নিবন্যাতরঙ্গের বেগ,
বিষশ্বাস ঝটিকার মেঘ,
ভূতল-গগন-
-মূর্ছিত বিহ্বল করা মরণে মরণে আলিঙ্গন—
ওরই মাঝে পথ চিরে চিরে
নূতন সমুদ্রতীরে
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি,
ডাকিছে কাণ্ডারী,
এসেছে আদেশ—
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মত হল শেষ,
পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা-কেনা
আর চলিবে না।

* * *

ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘে
কালোয় ঢেকেছে আলো, জানে না তো কেউ
রাত্রি আছে কি না আছে; দিগন্তে ফেনায়ে ওঠে ঢেউ

...বাহিরিয়া এল কারা ? মা কাঁদিছে পিছে,
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।...

উদ্ধৃতি আরও অসংখ্য দেওয়া যায়, কিন্তু তার আর প্রয়োজন নেই।

তত্ত্বপ্রধান কবিতা ছাড়া বলাকায় আরও কিছু কবিতা আছে যেগুলি তত্ত্ব-নিরপেক্ষ স্বাভাবিক সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং অন্তর-অনুভূতির গভীর স্পর্শে ও সুনিবিড় রহস্যময়তায় প্রকৃত কবিতা হয়ে উঠেছে। কখন কখনও কবিতাগুলি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত, কিন্তু উপলব্ধির মানবিকতায় তারা এই জগতেরই রূপরসগন্ধসঞ্চারী। যেমন উপহার (১০ সংখ্যক) কবিতা—

তার চেয়ে যবে
ক্ষণকাল অবকাশ হবে,
বসন্তে আমার পুষ্পবনে
চলিতে চলিতে অন্যমনে
অজানা গোপন গন্ধে পুলকে চমকি
দাঁড়াবে থমকি—
পথহারা সেই উপহার
হবে সে তোমার।
যেতে যেতে বীথিকায় মোর
চোখেতে লাগিবে ঘোর,
দেখিবে সহসা
সন্ধ্যার কবরী হতে খসা
একটি রঙিন আলো কাঁপি থরথরে
ছোঁয়ায় পরশমণি স্বপনের 'পরে—
সেই আলো, অজানা সে উপহার
সেই তো তোমার।

বা, আজ প্রভাতের আকাশটি এই
শিশির-ছলছল
নদীর ধারে ঝাউগুলি ঐ
রৌদ্রে ঝলমল, (মানসী/৩৫)

বা,

৪১ সংখ্যক পুরো কবিতাটি, এবং তার মধ্য থেকে—

অপরিচিতের এই চির পরিচয়
এতই সহজে নিত্য ভরিয়াছে গভীর হৃদয়,
সে কথা বলিতে পারি এমন সরল বাণী
আমি নাহি জানি।
শূন্য প্রান্তরের গান বাজে ওই একা ছায়ানটে
নদীর এ পারে ঢালু তটে
চাষী করিতেছে চাষ ;
উড়ে চলিয়াছে হাঁস
ওপারের জনশূন্য তৃণশূন্য বালুতীর তলে।
চলে কি না-চলে
ক্লান্তস্রোত শীর্ণ নদী, নিমেষনিহত
আধোজাগা নয়নের মতো।
পথখানি বাঁকা
বহুশত বরষের পদচিহ্ন-আঁকা
চলেছে মাঠের ধারে—ফসল ক্ষেতের যেন মিতা—
নদী-সাথে কুটিরের বহে কুটুম্বিতা।

সহজ সরল সরস স্বাভাবিক প্রকৃতি দৃশ্য। তাই স্নিগ্ধ কবিতা। আর একটি কবিতা, অল্প তত্ত্বাশ্রিত কিন্তু বিপুল রস-সঞ্চারী। কবিতাটি 'দুইনারী' (২৩ সংখ্যক)—

একজন তপোভঙ্গ করি
উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি—
দু হাতে ছড়ায় তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে,
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে,
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।

সৌন্দর্য, উদ্দামতা ও প্রলয়ংকরী শক্তির মিলনে যে প্রমত্তা নারীসত্তা তারই দিকে যৌবনের অর্ঘ উৎসর্গীকৃত পংক্তি কয়টিতে। দীপ্ত কাব্য সৌন্দর্যই

এখানে প্রধান। আর পরের অংশে শান্ত কল্যাণমূর্তি লৌকিক নারীসত্তার কাব্যিক স্পর্শ—

আরজন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশির স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়,
হেমন্তের হেমকান্ত সফল শক্তির পূর্ণতায় ;
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্বাদ-পানে
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্যসুধায় মধুর
ফিরাইয়া আনে ধীরে
জীবনমৃত্যুর
পবিত্র সংগমতীর্থতীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে।

এমনিভাবে কবিতাগুলি তত্ত্বকে কেন্দ্রে রেখেও বা না-রেখে মানবিক রসানুভূতির স্পর্শসিঞ্চিত অসংখ্য লৌকিক এবং প্রাকৃতিক চিত্রকল্প উপহার দিয়েছে। এবং সেই চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে যে সৌন্দর্য ও আনন্দ ব্যঞ্জিত ও আভাসিত হয়েছে, তা তাদের প্রকৃত কাব্যের জগতে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

রচনার কাব্যসৌন্দর্য্যের পরিচয় শুধু বিষয়ের মধ্যে থাকে না, বিষয়কে যে আঙ্গিকে ধারণ করা হয় তার মধ্যেও। বস্তুত বক্তব্য অনুসারে আঙ্গিকের বিশিষ্টতা যিনি অনুধাবন করতে না পারেন তিনি অ-কবি বা ক্ষীণশক্তি কবি। আলোচ্য কাব্যের আঙ্গিক নূতন। নবতর বক্তব্যকে রূপ দেওয়ার জন্যই এই আঙ্গিক। এই আঙ্গিকের শিল্প সৌন্দর্যও অতুলনীয়।

পরবর্তী আলোচনায় তা পরিষ্কার হবে।

[দুই]

কাব্য : বাণীরূপ

রবীন্দ্রনাথের জীবনে ভাব থেকে ভাবান্তরে কেবলই পদসঞ্চার। সার্থক কবি বিশেষ ভাবকে প্রকাশ করবার জন্য বিশেষ আঙ্গিকের প্রয়োজন উপলব্ধি

করেন। ভাব থেকে ভাবান্তরে অবিরাম চলমান রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবন তাই বারবার নূতন আঙ্গিক গ্রহণ করেছে নূতন ভাবকে প্রকাশ করবার জন্ত। জীবনের অভিজাত মহৎ অলঙ্কৃত ভাবগুলিকে প্রকাশের জন্য যেমন অলঙ্কৃত আঙ্গিকের প্রয়োজন, সরল সাধারণ দৈনন্দিন ভাবগুলিকে প্রকাশের জন্য তেমন অলঙ্কারহীন অচঞ্চল নিস্তরঙ্গ আঙ্গিকের দরকার। আবার জীবনের প্রচণ্ড গতিশীল দুর্বার ভাব-প্রেরণাকে প্রকাশের জন্য এমন আঙ্গিকের দরকার, যা সমস্ত সীমিত বাধাগ্রস্ত শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে অবাধ গতিতে চলমান হবে। জীবনে উপলব্ধীকৃত পরম সত্যকে প্রকাশের জন্য আবার তেমনি দরকার সংযত সংহত পিনদ্ধ আঙ্গিক। ভাব যেখানে তীব্র-প্রবহমান গতির পরিচয়বাহী, অথচ তারই অন্তরালে পরম এবং স্থির জীবনসত্য আভাসিত, আঙ্গিক সেখানে দ্বৈত বৈশিষ্ট্যে বিধৃত,—একদিকে ভাষার সংসক্তিতে জীবন চেতনার গভীরে অবগাহন, অপর দিকে গতির প্রচণ্ডতায় আঙ্গিক কোথাও বা উচ্ছ্বসিত নদী তরঙ্গের মত কখনও কূলপ্লাবী, কখনও বা তীব্র সংঘাতে সংঘাতে আবর্ত-সঙ্কুল; আবার কোথাও বা প্রচণ্ড গতিময়তায় শ্রান্ত হয়ে তার পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য হ্রাসমান।

রবীন্দ্রনাথের বলাকা কাব্যের ক্ষেত্রেও বিশেষ ভাবগত প্রয়োজনে ভাষা ও ছন্দ-আঙ্গিক বিশিষ্টরূপ ধারণ করেছে। এই কাব্য গ্রন্থটির ভাব-চেতনার মধ্যে কবি গতি-দর্শনকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। ভারতীয় উপনিষদ এবং পাশ্চাত্ত্য ডারউইন এবং বার্গসঁর বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক গতিচেতনা এবং তার সঙ্গে সারা পৃথিবীর শোষিত-নিপীড়িত মানবের পক্ষ অবলম্বনকারী মানবিক চেতনার সম্মিলনে এই গ্রন্থ বিশিষ্ট তত্ত্বরূপ লাভ করেছে। অকারণ অবারণ চলার বিশিষ্ট ভাবকে কবি যেমন এই কাব্যে রূপদান করতে চেয়েছেন, তেমনি আবার তাঁর বিশিষ্ট মানবচেতনা নবতর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যে নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছে, তাকেও ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। এই নূতন পৃথিবীর নবজাগ্রত চেতনার সমিধ সংগ্রহের জন্য কবি ডাক দিয়েছেন যৌবনকে, যুবশক্তিকে। এই গতিচেতনা, বিপ্লবচেতনা এবং যৌবনের জয়গান প্রকাশ করতে গিয়ে আলোচ্য কাব্যের ছন্দও হয়ে উঠেছে নবতররূপে গতিময়, যৌবনদীপ্ত এবং বিপ্লবচেতনাস্পন্দিত।

আলোচ্য কাব্যের উপরিউক্ত বিশিষ্ট ভাবযুত পংক্তিগুলি সীমার বন্ধন অতিক্রম করে সর্বপ্রকার স্থিরতাকে আঘাত করে গতির আনন্দে কখনও দীর্ঘ

ধারায় প্রবাহিত, কখনও সংযোগকারী চরণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন, কোথাও বা বেগের আবেগে পরবর্তী চরণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছন্দ হিল্লোল সৃষ্টি করেছে। কোন কোন চরণ মুক্তির আনন্দে নিজে কেটে গিয়ে দ্বিধাবিভক্ত, কোথাও বা একটি বিশিষ্ট আবেগে একটিমাত্র শব্দে একটি নূতন চরণের সৃষ্টি। এই জাতীয় অসমমাত্রিক ছন্দই বলাকা কাব্যের অভিনবত্ব, এবং এই কাব্যের বিশিষ্ট ভাবের সার্থক ধারক। উদাহরণ দেওয়া যাক,—

(১) সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার ;
দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এল তার ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে ;
(৩৬ সংখ্যক কবিতা)

(২) বহ্নি বন্যাতরঙ্গের বেগ,
বিষশ্বাস ঝটিকার মেঘ,
ভূতল-গগন-
-মূর্ছিত-বিহ্বল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন—
ওরই মাঝে পথ চিরে চিরে
নূতন সমুদ্রতীরে
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি,
ডাকিছে কাণ্ডারী, (৩৭ সংখ্যক)

(৩) জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কানে।
প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিল তা
সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে। (৭ সংখ্যক)

বলাকা কাব্যের গতি-চেতনা ছন্দের উপরিউক্ত মুক্ত পদচারণার মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত। কিন্তু আলোচ্য কাব্যে শুধু গতির কথাই নেই, সেখানে 'অবিরাম গতি অবিচলিত বিরামের মধ্যে আত্মসমর্পণ করে' সার্থক হয়ে উঠেছে। দ্রুত চলমানতা সেখানে স্থির-প্রত্যয় গন্তব্যের দিকে ধাবমান। আঙ্গিকের ক্ষেত্রে এই দ্বৈত বৈশিষ্ট্যর প্রকাশ—এই কাব্যের ছন্দের প্রবহমানতা এবং ভাষার সংহতিতে। গতি এবং সংহতির বিচিত্র মিলনেই বলাকার আঙ্গিক সার্থক। যে শিল্পীর আঙ্গিকধর্মে শুধু গতি আছে, সংহতি নেই,— তিনি উচ্ছ্বাসর্বস্ব, উদ্দাম। আর যাঁর আছে শুধু সংহতি, কিন্তু গতি নেই, তিনি নিরেট; তার আঙ্গিক স্থবির ভারবহুল প্রস্তরস্তূপের মত। রবীন্দ্রনাথের বলাকা-কাব্যে দুইয়ের সার্থক সম্মিলনে তাঁর কাব্য-ভাবনা যথার্থ আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত। ছন্দের গতিময়তার উদাহরণ আগে দিয়েছি। এবার ভাষার সংহতির কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক। এই সংহতি এসেছে সুনির্বাচিত এবং সংহত শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে। 'রাজশক্তি বজ্র সুকঠিন', 'সন্ধ্যারক্তরাগসম', 'হারামুক্তামাণিক্যের ঘটা', 'ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা', 'দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণে', 'ক্লান্ত সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে', 'স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি' প্রভৃতি ৭ সংখ্যক কবিতা থেকে গৃহীত উদ্ধৃতিগুলিতে একটি শব্দে বা একটি বাক্যাংশে, কখনও বা একটি বাক্যে একটি সমগ্র অনুচ্ছেদের ভাব প্রকাশিত;—একটি দীর্ঘায়িত বক্তব্য অতি স্বল্প সীমার মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়ে বিন্দুতে সিন্ধুর দ্যোতনা সঞ্চার করেছে। অন্যান্য বিভিন্ন কবিতায়ও এই জাতীয় অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। তার কিছু পরিচয়,—৩৭ সংখ্যক কবিতায় 'ক্রন্দনের কলরোল', 'লক্ষবক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল', 'বহ্নিবন্যাতরঙ্গের বেগ', 'ভূতল-গগন-মূর্ছিত-বিহ্বল-করা,; ৩৬ সংখ্যক কবিতায় 'অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ', 'ঝঞ্ঝামদরসেমত্ত', 'শব্দময়ী অপ্সররমণী', 'বেগের আবেগ', 'নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে'; ৬ সংখ্যক কবিতায় 'আকাশের নীড়', 'স্থিরতার চির অন্তঃপুরে', 'আকাশ পাথারে', 'সহস্র ধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন নির্ঝরিণী'; ৮ সংখ্যক কবিতায় 'স্পন্দনে শিহরে শূন্য', 'পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তু ফেনা', 'সঞ্চয়ের অচল বিকারে', 'নৃত্যমন্দাকিনী' প্রভৃতি। শব্দ, পদ বা বাক্যাংশগুলি ক্ষুদ্র হীরকের মত সংহত-কঠিন, আবার হীরকের মতই বর্ণালিবিচ্ছুরিত জীবনসত্য প্রকাশসক্ষম তাদের তীক্ষ্মমুখ দ্যুতিময়তার মধ্য দিয়ে।

এইখানে একটি কথা পরিষ্কার করে নেওয়া যাক। আলোচ্য কাব্যে ৪৫টি কবিতা। এর মধ্যে ১০টি সমপংক্তিক এবং একটি সনেট আকারবদ্ধ। বাকী ৩৪টি বিষম ছন্দের রচিত। এই ৩৪টি কবিতার ছন্দকেই 'বলাকার ছন্দ' নামে অভিহিত করা হয় এবং এদের মধ্যেই পূর্বে উল্লেখিত ছন্দ-বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত।

ছন্দের গতিময়তা এবং ভাষার সংহতি—এই দুইয়ের সার্থক সম্মিলনে বলাকার আঙ্গিক গঠিত। তার ফলে এই কাব্যের কবিতাগুলির পংক্তিছন্দে, পাদ-গঠনে এবং অনুচ্ছেদ বা স্তবকের আকৃতিতে এমন এক অভিনবত্ব এসেছে যা প্রাক্-বলাকা কাব্যে দুর্লভ। ঐ বিশিষ্ট আঙ্গিকের কবিতাগুলি বিচিত্র গঠনের স্তবক সমবায়ে রচিত এবং প্রত্যেক স্তবক আবার বিভিন্ন প্রকার পংক্তির সমন্বয়ের ফল। একই কবিতায় একই প্রকার স্তবক যেমন একাধিকবার পুনরাবৃত্তি করেনা, তেমনি একই স্তবকে একই প্রকারের পংক্তিও পুনরাবৃত্তি করে না। প্রত্যেকটি স্তবক এবং স্তবকঅন্তর্গত প্রত্যেকটি পংক্তি অনন্য, আপন বিশিষ্টতায় পরিচ্ছিন্ন। কিন্তু তবুও পংক্তি ও স্তবকগুলির যোগসূত্র ছিন্ন হয় না। কারণ ভাবগত সংহতির ফলেই বিচিত্র পংক্তিগুলি এক-একটি বিশিষ্ট ভাবধৃত স্তবকের সৃষ্টি করে এবং কবিতার সামগ্রিক প্রয়োজনে বিচিত্র স্তবকগুলি একটি অখণ্ড কাব্যসত্তায় বিধৃত হয়। ভাব সেখানে আপন গতির স্রোতে চলে বলে তাকে পংক্তির একটি নির্দিষ্ট, বিশেষ, অনুবৃত্তিময় রূপবদ্ধতায় বাঁধা যায় না ; কিন্তু আবার এই অসম পদসঞ্চারের মধ্যে গভীর সংহতি এক-একটি স্তবক-আয়তনের সৃষ্টি করে। আবার বিচিত্র ভাববদ্ধ বলে প্রত্যেক স্তবক আপন স্বকীয়তায় অনন্য হয়েও সমগ্র কবিতার ভাব-সংহতির মধ্যে তারা স্থির-সার্থকতায় আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। বিচিত্র পংক্তির সমবায়ে রচিত একটি স্তবকের উদাহরণ দেওয়া যাক,—

হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে ;
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তু ফেনা ওঠে জেগে ;

আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া ওঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হতে ;
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্যচন্দ্র তারা যত
বুদ্‌বুদের মতো ।

(৮ সংখ্যক কবিতা)

এই ছন্দের বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করতে গিয়ে কেউ কেউ এই ছন্দের মুক্ত স্বভাবকে অনুসরণ করে নাম দিয়েছেন 'মুক্তক ছন্দ'; আবার কারো মতে এর নাম 'মুক্তবন্ধ' ছন্দ। কেউ কেউ এটিকে আবার অমিত্রাক্ষর ছন্দেরই রবীন্দ্রনাথকৃত এক অভিনব রূপ বলে মনে করেন, তবে এই অমিত্রাক্ষর অন্ত্যানুপ্রাস যুক্ত। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যেও এই জাতীয় ছন্দের অভাব নেই। সেখানে এই জাতীয় ছন্দকে বলা হয় Free Verse বা Verse-Libre।

যাঁরা 'বলাকা'র ছন্দকে রাবীন্দ্রিক ঢঙের অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলেন, তাঁদের মতে এর পূর্ণচরণের দৈর্ঘ্য একটি মহাপয়ার (৮+১০ মাত্রা) বা পয়ারের (৮+৬ মাত্রা) দৈর্ঘ্যের সমান। কেবল পার্থক্য এই যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে যেখানে চরণগুলি সমমাত্রিক, সেখানে এই ছন্দের পর্বগুলি মুক্তবন্ধ হওয়ায়, তাদের চরণগুলি হয়েছে অসম বা বিষমমাত্রিক। তার ফলে পর্বগুলি যুক্ত অবস্থায় কোথাও বা পয়ার বা মহাপয়ারের চরণ সৃষ্টি করে, কোথাও বা খণ্ডিতভাবে নিজেই একটি অপূর্ণপদিক চরণরূপে অবস্থান করে। আবার কোথাও তিনটি চরণ এক হয়ে একটি সুদীর্ঘ ত্রিপদীর সৃষ্টি করে। চরণ যে-প্রকারেরই হোক না কেন, দুই চরণের শেষে অন্ত্যানুপ্রাস রয়েছে। তবে একটা কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে যেখানে পর্বগুলির পর্বাঙ্গে মিল রয়েছে অথবা যেখানে কোন পর্বের যুগ্মমাত্রিক অংশের সংগে পূর্ববর্তী বা পরবর্তী চরণের অন্ত্যমিল রয়েছে, সেখানে পর্বগুলিকে ভেঙে দুটি ছত্রে লেখা হয়েছে। সেসব ক্ষেত্রে মিলযুক্ত পর্বাঙ্গ দুটিকে মিলিয়ে একটি খণ্ডিত পর্বের চরণ অথবা পূর্বের বা পরের চরণের সঙ্গে যুক্ত করে একটি পূর্ণ চরণ ধরতে হবে। কিছু উদাহরণ দেওয়াযাক,—

(১) হে সম্রাট | , তাই তব শঙ্কিত হৃদয় (৪ + ১০)

চেয়েছিল করিবারে | সময়ের হৃদয় হরণ।] (৮ + ১০ + ৬)
সৌন্দর্যে ভুলায়ে।

কণ্ঠে তার কি মালা দুলায়ে] (১০ + ৬)
করিলে বরণ

রূপহীন মরণেরে | মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে ? (৮ + ১০)

রহে না যে] (৪ + ৮ + ৪)
বিলাপের অবকাশ
বারো মাস,

তাই তব অশান্ত ক্রন্দনে (১০)

চির মৌন জাল দিয়ে | বেঁধে দিলে কঠিন বন্ধনে (৮ + ১০)

(৭ম সংখ্যক কবিতা)

(২) শুধু ধাও, শুধু ধাও, | শুধু বেগে ধাও , (৮ + ৬)

উদ্দাম উধাও ;] (৬ + ৪)
ফিরে নাহি চাও

যা-কিছু তোমার সব | দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও। (৮ + ১০)

(৮ সংখ্যক কবিতা)

আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় এই ছন্দকে 'যৌগিক মুক্তক-ছন্দ' বলেছেন। কিন্তু অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এই ছন্দকে 'মুক্তক' ছন্দ বলে স্বীকার করেন না। তিনি মনে করেন এই ছন্দে চরণ এবং বিচ্ছিন্ন পর্বের সমাবেশে এক-একটি স্তবক গঠনের নূতন আদর্শ ফুটে উঠেছে।

তিনি বলেছেন, এই ছন্দের পূর্ণ চরণগুলি দুটি পর্ববিশিষ্ট এবং তাদের সঙ্গে অপূর্ণ চরণের সমাবেশে স্তবকের মধ্যে বৈচিত্র্য সঞ্চারিত হয়েছে। তিনি এক-একটি স্তবককে পুনঃ সজ্জিত করে এর অভ্যন্তরস্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দ-বৈশিষ্ট্যকে উদ্ঘাটিত করেছেন। যথা,

হে ভুবন | আমি যতক্ষণ | তোমারে না
বেসেছিনু ভালো ॥ ততক্ষণ তব আলো।
খুঁজে খুঁজে পায় নাই | তার সব ধন ॥
ততক্ষণ | নিখিল গগন | হাতে নিয়ে
দীপ তার | শূন্যে শূন্যে ছিল পথ চেয়ে ॥ (১৭ সংখ্যক)

অমূল্যবাবু আরও বলেছেন, হয়তো মাঝে মাঝে এই ছন্দে অমিত্রাক্ষরের রূপ ধরা পড়ে না। এর কারণ বাংলা ছন্দের একটি বিশিষ্ট রীতি। প্রাচীনকাল থেকে বাংলা ছন্দের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছন্দের অতিরিক্ত দু-একটি শব্দ ব্যবহার করা। নদীর মধ্যে মাঝে মাঝে শিলা খণ্ড থাকলে স্রোতের প্রবাহ যেমন উচ্ছল ও আবর্তময় হয়ে ওঠে, ছন্দের প্রবাহের মধ্যেও সেরূপ দু-একটি শব্দ থাকলে, ছন্দও সেখানে আবর্তময় প্রবলতার সৃষ্টি করে। তার ফলে কবিতার স্তবকের মধ্যে বৈচিত্র্যের সঞ্চার হয়। এ-যেন বাঙ্‌লা কীর্ত্তনে 'আখর' যোগ দেওয়ার পদ্ধতির মত। অমূল্যবাবুর মতে বলাকার মধ্যেও এমনতর অতিরিক্ত শব্দ বা শব্দসমষ্টি ব্যবহার করা হয়েছে এবং তার ফলে ঐ সকল বিশেষ স্থানে ছন্দের বিশিষ্ট বৈচিত্র্যও সৃষ্টি হয়েছে বটে, কিন্তু ওগুলিকে বাদ দিলে এই ছন্দের পরিপূর্ণ অমিত্রাক্ষর বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আধুনিক ছন্দ-আলোচকগণ অমূল্যবাবুর মত সমর্থন করেন না। তাঁদের মতে বলাকার ছন্দ 'মুক্তক ছন্দ'ই (Free Verse) বটে, অমিত্রাক্ষরের রূপবিশেষ নয়। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই পূর্ণপদী ও অপূর্ণপদী চরণের সমাবেশে স্তবক গঠন করেছেন, এবং প্রত্যেক চরণের শেষে অন্ত্যানুপ্রাস ব্যবহারের দ্বারা এই ছন্দ যে অমিত্রাক্ষর নয়, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। অমিত্রাক্ষররূপে চরণগুলি বিন্যস্ত করে এই ছন্দ পড়া যেমন কষ্টসাধ্য, তেমনি এ-ভাবে পড়াতে কবিতাগুলির ভাবপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত এবং সম্পূর্ণ কবিতাটি অর্থহীন হয়ে পড়ে। অথচ চরণগুলি ভাব অনুযায়ী সাজানর ফলে অসম হলেও ঠিকমত মিলিয়ে পড়া যায় এবং প্রকৃত ভাবগ্রহণ সম্ভব হয়। 'বলাকা'র' ছন্দই কালক্রমে বিবর্তিত হয়ে গদ্য ছন্দ এবং 'পুনশ্চ'র ছন্দের জন্ম দিয়েছে।

বলাকা কাব্যের ছন্দের মধ্যে গতি, এবং শব্দ, বাক্য ও বাক্যাংশের মধ্যে সংহতি,—এই দুইয়ের মিলনের মধ্য দিয়ে বলাকার মূলভাব, গতি এবং স্থির-প্রত্যয়ের সার্থক অভিব্যক্তি, এ-কথা আগেই বলেছি। বলাকার আঙ্গিকগত আরো বৈশিষ্ট্য,—এই কাব্যের ভাষা তীক্ষ্ণ, দীপ্ত, শাণিত, ঝকঝকে; সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি ও বোধিকে তীব্র ভাবে সচেতন করে দেয়। ভাষার সংহতি প্রসঙ্গে যে উদাহরণগুলি দিয়েছি, সেগুলি (৮ ও ৩৬ সংখ্যক কবিতা বিশেষভাবে) এ-প্রসঙ্গেও স্মরণীয়। শব্দ ও বাক্যগুলি অপূর্ব ব্যঞ্জনাগর্ভ ও চিত্রকল্প প্রতিভাসক। কাব্যসত্তা প্রসঙ্গে তার বহু উদাহরণ দিয়েছি।

বলাকা কাব্যের আঙ্গিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য,—বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে বক্তব্যকে তীক্ষ্ণ করে তোলা। যেমন, 'সকলের মাঝে থেকে সবা হতে আছ এত দূরে', 'রূপহীন মরণের মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে', 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ', 'বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা ওঠে জেগে', 'যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই', 'মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে' প্রভৃতি। এমনিভাবে এই কাব্যের ছন্দ, ভাষা বাক্‌রীতি, শব্দ-ব্যঞ্জনা এই কাব্যের সৌন্দর্য, গতি, স্থিতি এবং অভিনবত্বকে অপূর্ব সার্থকতায় অভিব্যক্ত করে তুলেছে। বলাকার আঙ্গিক প্রাক-বলাকা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ।

[তিন]

কবি-মানস ও তত্ত্ব : গতিবাদ

রবীন্দ্রনাথের জীবন-চেতনা বার বার ভাব থেকে ভাবান্তরে, রূপ থেকে রূপান্তরে গমন করেছে। স্থিতিতে মৃত্যু এবং গতিতে জীবন,—এ কথা কবি মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন, এবং তাঁর জীবনে ও সাহিত্যে এই চেতনা বিশিষ্ট ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। কখনও এই চেতনা তাঁর সাহিত্যে আবেগরূপে প্রকাশিত, কখনও বা উপলব্ধিরূপে, আবার কখনও এই উপলব্ধি গভীর তত্ত্ব-রূপ লাভ করেছে এবং দার্শনিক প্রত্যয়রূপে তাঁর সাহিত্যে হয়েছে প্রকাশিত। বলাকা গ্রন্থখানি কবির এই বিশিষ্ট দার্শনিক প্রত্যয়ের বা তত্ত্বের কাব্যিক রূপ। এখানে এ-কথাটি মনে রাখা দরকার যে রবীন্দ্র-জীবনে উপলব্ধীকৃত বিশিষ্ট তত্ত্ব যখন কাব্য-বদ্ধ হয়েছে, তখন তা আর তত্ত্বের শুষ্ক কঙ্কাল মাত্র না-থেকে কাব্যিক রূপ-লাবণ্যে ঝলমল করে উঠেছে। বলাকা কাব্যের গতিতত্ত্ব এমনই কাব্যিক সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত। এর কাব্য-সৌন্দর্যের পরিচয় আগেই দিয়েছি।

রবীন্দ্র-মানসের গতি-চেতনার বিশিষ্ট পটভূমি রচিত হয়েছে সমকালীন পাশ্চাত্ত্য এবং প্রাচ্য-উপনিষদীয় দার্শনিক চেতনা, উনিশ-বিশ শতকীয় য়ুরোপীয় বিজ্ঞান-চেতনা, এবং রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সভ্যতার বিবর্তন-চেতনার সম্মিলিত ফলশ্রুতি দ্বারা। এর সঙ্গে মিলিত ছিল কবির নিজস্ব জীবন-উপলব্ধি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ডারউইনের জৈব বিবর্তন-বাদের প্রতিষ্ঠা। বিবর্তনবাদ

সমগ্র পৃথিবীর চিন্তাশীল মানুষদের বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। জীবন সংগ্রাম (Struggle for existence), প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural selection) এবং যোগ্যতমের সংরক্ষণ (Survival of the fittest) নীতির মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র 'ভাইরাস' লক্ষ কোটি বৎসরের বিবর্তন ধারায় পরিবর্তিত হতে হতে আজ উচ্চতম প্রাণী বুদ্ধিশীল মানব-সত্তার (Homo Sapiens) উদ্ভব সম্ভাবিত করেছে। কিন্তু বিবর্তন শুধু জৈব ক্ষেত্রেই নয়, একদিকে আমাদের বিশ্ব (বা বস্তুবিশ্বও) দীর্ঘ বিবর্তন ধারার মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হতে হতে চলেছে, অপর দিকে মানুষের সমাজ-জীবনও বিবর্তনপথ-যাত্রী। আইনস্টাইন, হাইসেনবার্গ, জিন্‌স্‌, এডিংটন, প্লাঙ্ক প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক এবং হার্বার্ট স্পেনসার, কঁৎ, ম্যাকাইভার, পেজ, গিন্‌স্‌বার্গ প্রভৃতি সমাজ তাত্ত্বিকদের গবেষণার দ্বারা এই সত্য প্রতিষ্ঠিত।

পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকরাও বহুদিন ধরে বিবর্তনবাদের কথা বলে আসছিলেন। অবশ্য প্রাচীন কালের একমাত্র এরিস্টটলের কথা বাদ দিলে, এঁদের চিন্তা মুখ্যত জৈববিবর্তন-চেতনার প্রভাবের ফলশ্রুতি। হার্বার্ট স্পেনসার, আঁরি বার্গসঁ, সিদয়ড, মর্গান, স্যামুয়েল আলেকজাণ্ডার প্রভৃতি দার্শনিক দিক দিয়ে বিবর্তনবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

জৈববিবর্তনবাদীদের তত্ত্বের কথা আগেই বলেছি। বিশ্ববিবর্তনবাদীদের মতে এই বিশ্ব তার অভ্যন্তরস্থ সবকিছু নিয়ে ক্রমপ্রসারণশীল। একটি মতে এই প্রসারণ এক সময়ে চরম সীমায় আসবে এবং তখন আবার শুরু হবে ক্রমসঙ্কোচ। পেণ্ডুলামের মত অনন্তকাল ধরে এই ক্রমপ্রসার ও ক্রমসঙ্কোচ চলবে। অন্য মতে প্রসারণের শেষে বিশ্ব বুদ্‌বুদের মত ফেটে যাবে। বিশ্ববিবর্তনের ফলেই এই বিশ্বের বস্তু এবং শক্তি (matter aud energy)-র সৃষ্টি এবং তার থেকেই বস্তুজগতের বিবর্তন—নীহারিকা, নক্ষত্র, গ্রহ এবং গ্রহের বুকে প্রাণ এবং প্রাণের নব নব জটিল রূপ পরিগ্রহণ। এই বিবর্তনের ফলে স্থান ও কালের (Time & Space) অনুভূতি। প্রতি মুহূর্তে এ-বিবর্তন ক্রিয়াশীল।

দার্শনিক বিবর্তন-চেতনাও বৈজ্ঞানিক বিবর্তনচেতনার মতই, গতিই যে বিশ্বের একমাত্র এবং চরম সত্য, এই মতের সমর্থক। দার্শনিক স্পেনসারের মতানুসারে বিবর্তন-প্রক্রিয়ার দ্বারা অনির্দিষ্ট অসংবদ্ধ একরূপধারী জড়বস্তু অপেক্ষাকৃত সুনির্দিষ্ট সুসংবদ্ধ বহুরূপের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়। তাঁর মতে

ক্রমবিকাশ পরিবেশের উপর নির্ভরশীল, যান্ত্রিক (mechanical) এবং বহুলাংশে প্রাক্-উদ্দেশ্যনিয়ন্ত্রিত।

দার্শনিক বার্গসঁ স্পেনসারের মতকে আরও উন্নত ও ত্রুটিমুক্ত করেন। তিনি 'Creative evolution' (১৯০৭) নামক গ্রন্থে তাঁর দার্শনিক বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। বার্গসঁর মতে এই বিশ্বে কাল (Time)-সহ সব কিছুই পরিবর্তনশীল। তিনি তাঁর গ্রন্থে এই বক্তব্য রেখেছেন যে, 'To exist is to change, to change is to mature'—প্রাণের স্বরূপ গতি এবং গতির ফলেই তার পরিণতি সম্ভব। তিনি স্পেনসারের মতো বস্তুর বিবর্তনকে পরিবেশগত ও যান্ত্রিক বলে স্বীকার করলেন না। পক্ষান্তরে তিনি একে আভ্যন্তরীন প্রাণশক্তি ('Elan vital')-র ক্রিয়াজাত বলে রায় দিলেন। তিনি আরও বললেন যে এই ক্রমবিকাশ কোন প্রাক্ উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। ক্রমবিকাশের প্রত্যেক স্তরে নব নব জিনিষের উদ্ভব হয়, অর্থাৎ এই ক্রমবিকাশ সৃজনশীল। জগতের যাবতীয় পরিবর্তনের পশ্চাতে যদিও একই প্রাণ-প্রেরণা ক্রিয়াশীল, কিন্তু তাদের অন্তিম পরিণতি এক নয়।

বার্গসঁর পরেও মর্গান, আলেকজাণ্ডার প্রভৃতি দার্শনিকেরা বিবর্তনের রীতি-প্রকৃতি নিয়ে চিন্তা করেছেন। কিন্তু তা বলাকা-উত্তর কালের ব্যাপার, —সুতরাং আমাদের আলোচনা বহির্ভূত। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলা হয়, তিনি বার্গসঁর দার্শনিক চেতনা দ্বারা সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং বলাকা কাব্যে তারই সর্বাধিক প্রতিফলন।

কিন্তু প্রত্যক্ষত রবীন্দ্রমানসের বলাকা রচনাকালীন গতিদর্শন তাঁর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক চিন্তার ফল। সমকালীন য়ুরোপের ও য়ুরোপ-অধিকৃত সারা পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় পটভূমি ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষা কবির মনে এক শ্রেয়-পরিণতি সম্পন্ন বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার চিন্তা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। Industrial revolution বা শিল্পবিপ্লবের ফলে য়ুরোপ যে প্রভূত যান্ত্রিক শক্তির অধিকারী হয়েছিল, তাকে সম্বল করে য়ুরোপীয়গণ য়ুরোপের বাইরে অন্যান্য মহাদেশে কলোনী স্থাপন ও উৎপাদিত সামগ্রীর বাজার পাওয়ার জন্য অধীর হয়ে উঠেছিল। অবশ্য তারও আগে রেনেশাঁসের ফলে য়ুরোপ জগৎ-আবিষ্কারের প্রেরণায় সমুদ্রযাত্রা করেছিল এবং নূতন নূতন দেশে গিয়ে পৌঁছেছিল। এর ফলে নবশক্তিধর য়ুরোপীয় দেশগুলি অন্যান্য দেশে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছে এবং স্থানীয় দুর্বল ও সরল অধিবাসীদের নানাভাবে প্রবঞ্চিত ও শোষণ

করেছে। প্রাচীন সংস্কারাচ্ছন্ন জীবন-সম্পর্কে-হৃতমূল্য স্থানীয় জনসাধারণ এই প্রবঞ্চনা ও শোষণের বিরুদ্ধে কোন সার্থক প্রতিবাদ জ্ঞাপন করতে পারেনি। এমনই ভাবে য়ুরোপের বাইরে প্রায় অন্য সকল মহাদেশে য়ুরোপীয়দের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আফ্রিকা টুকরো টুকরো হয়ে য়ুরোপের বিভিন্ন জাতির কলোনীর আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করেছে, আমেরিকার স্থানীয় সভ্যতা সমূলে ধ্বংস হয়েছে, এশিয়া মহাদেশে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ বৃটিশের পদানত হয়েছে, আফিংএর পিণ্ডে চীনকে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত করবার ব্যবস্থা হয়েছে সম্পূর্ণ। এর পর স্বার্থান্ধ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বেধেছে সংঘাত,—কে পৃথিবীর আধিপত্য গ্রহণ করবে। য়ুরোপীয় আধিপত্যের এই অজগর গ্রাস থেকে সমগ্র পৃথিবীকে মুক্ত করবার জন্য প্রয়োজন দেখা দিয়েছে স্থানীয় অধিবাসীদের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আত্মিক সচেতনতার, শ্রেয় চেতনাত্মক নবতর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সংস্কারমুক্ত নবজীবনায়নের, প্রাচীন স্থবিরত্ব থেকে নবতর জীবনাবেগের মধ্যে পদচারণার। কবিমানসস্থিত গতিচেতনার প্রত্যক্ষ সমিধ সংগৃহীত হয়েছে এই রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক চিন্তা থেকে।

রবীন্দ্রমানসের গতিচেতনা• উপরিউক্ত তিনটি কারণের সম্মিলিত ফলশ্রুতি। সমকালীন দর্শনচেতনা, বিজ্ঞানচেতনা ও রাষ্ট্রিক-সামাজিকচেতনা কবিমানসে যে আলোড়ন ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল, এবং যে-সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিল, তার ফলে কবি বুঝতে পেরেছিলেন, গতিই সত্য; নব-নব রূপের মধ্য দিয়ে জীবনের নব নব অভিব্যক্তিই যেমন সৃষ্টির সার কথা, তেমনি সকল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অত্যাচার-চিহ্নিত স্থিতাবস্থা থেকে মুক্তির জন্য বিপ্লব দরকার। স্থিতি, গতিহীনতা, থেমে যাওয়া বা থেমে থাকাই ব্যক্তিগত, জাতিগত বা প্রাকৃতিক মৃত্যুর কারণ।

কিন্তু উপরিউক্ত পাশ্চাত্য গতিচেতনার সঙ্গে রবীন্দ্র উপলব্ধীকৃত গতিচেতনার পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য গভীর তলসঞ্চারী। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদ বা দার্শনিক বিবর্তনবাদে যে গতির কথা আছে, তা কোন স্থির ধ্রুব গন্তব্যের দিকে পদসঞ্চারী নয়; এ শুধু অকারণ ও অবারণ পথচলা, শুধু রূপ থেকে রূপান্তর, কেবলই হয়ে ওঠা—becoming। কিন্তু কেন এই হয়ে ওঠা, কোন ধ্রুব শ্রেয়কে অভিব্যক্ত করবার জন্য, তার কোন সদর্থক উত্তর নেই। একের মৃত্যুতে সেখানে অপরের অগ্রগতি, সেই অপরও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পরবর্তীর অগ্রগতির সূচনা করে; সেখানে এক-একটি স্তরের সৃষ্টি,

কেবলমাত্র পরবর্তী স্তরকে অভিব্যক্ত করবার জন্য। চিরন্তন এই প্রবাহ—Eternal Flux। কিন্তু কেন? কোন পরিণতিতে গিয়ে, কোন সার্থকতায় গিয়ে, কোন গন্তব্যে পৌঁছিয়ে শান্ত হওয়ার জন্য?

যদিও বলাকা-কাব্যের কবিমানস এই অকারণ-অবারণ গতির অতি কাছাকাছি গিয়েছিল, তবুও শেষ পর্যন্ত এই অর্থহীন পরিণামহীন গতিকে চরম সত্য বলে স্বীকার করতে পারেনি। রবীন্দ্রমানস শেষ পর্যন্ত শ্রেয় পরিণতি ও ধ্রুবগন্তব্যে বিশ্বাসী। এর অন্যতম কারণ রবীন্দ্রমানসস্থ বিশিষ্ট জীবন-চেতনার উৎস যত না পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক চেতনায়, তার অপেক্ষা অনেক বেশী প্রাচ্য উপনিষদীয় চেতনায়। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের স্তন্যপানপুষ্ট শিশু। আবাল্য তাঁর মন উপনিষদ থেকে সমিধ সংগ্রহ করেছে। উপনিষদেও গতির কথা আছে বটে, অনেক গভীর ভাবেই আছে, কিন্তু সে গতি অকারণ অবারণ অনির্দেশ্য নয়, তা একটি স্থির সত্যে ব্যাপ্ত, পরম ঐক্যে বিধৃত। সে গতি স্থির লক্ষ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, নিশ্চিত উদ্দেশ্য দ্বারা চিহ্নিত; সে গতি পরিণতিতে এক পূর্ণতার তীর্থ-অভিযাত্রী।

ভারতীয় আর্য ভাষায় 'জগৎ' (√গম্ + ক্বিপ্) শব্দের অর্থই 'যা গমন করছে' অর্থাৎ যা গতিশীল। ভারতীয় আর্য চেতনায় এই জগৎ বা বিশ্ব সর্বদাই গতিময়, জঙ্গম। এই জগতের সঙ্গে সঙ্গে এর অভ্যন্তরস্থ, এতে প্রতিষ্ঠিত সকল কিছুও গতিশীল। 'ঈশোপনিষদে'র প্রথম শ্লোকেই বলা হয়েছে,—

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

(৭ম উদ্বোধন সং থেকে উদ্ধৃত)

অর্থ: জগতে অর্থাৎ গতিশীল বিশ্বে যা কিছু আছে, সবই গতিশীল; কিন্তু এ সবই একমাত্র ঈশ্বরদ্বারা আচ্ছাদিত। অর্থাৎ গতিশীল হওয়া সত্ত্বেও সবকিছুই ঈশ্বরের মধ্যে বিধৃত। তাঁকে অতিক্রম কোন গতিশীলের পক্ষেই সম্ভব নয়, কারণ সব গতিই তাঁতেই ব্যাপ্ত। এই গতিশীল জগতে ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর, কারও ধন আকাঙ্ক্ষা করো না। ত্যাগ কারো, অর্থাৎ কোন কিছুতে স্থায়ীভাবে লিপ্ত হয়ে যেও না। কারণ জীবনোপভোগ বা বেঁচে থাকার অর্থই সব কিছু ছাড়তে ছাড়তে কেবলই চলা। এই চলার পথে কোন বস্তুকে পরমঐশ্বর্য মনে করে তাতে লিপ্ত হয়ে সেখানে স্থির হয়ে যাওয়াই মৃত্যু।

তাতেই জীবনোপভোগ তথা জীবনপ্রবাহের শেষ। তাই ছাড়তে ছাড়তে, ত্যাগ করতে করতে চলাই প্রকৃত পক্ষে জীবন ভোগকরা। কিন্তু তবুও ভয় নেই। কারণ সকল চলমানতাই ঈশ্বরে বিধৃত। তিনি ধ্রুব. তিনিই পরম। অতএব এই গতি অকারণ অবারণ অধ্রুব অভিমুখে পরিচালিত নয়।

এমন ভাবে প্রাচ্য উপনিষদে গতির কথা এবং ধ্রুব গন্তব্যের ইঙ্গিত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গতিচেতনা শেষ পর্যন্ত প্রাচ্য উপনিষদীয় চেতনার সমধর্মী। উপনিষদীয় ভাবলালিত রবীন্দ্রমানসের গতিচেতনার পশ্চাতে সম্ভবত এই উপনিষদীয় গতিই প্রেরণা রূপে সঞ্চারিত। আর তারই ফলে রবীন্দ্রনাথ অকারণ অবারণ গতির কথা বলতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত গতির পরিণামে এক পরম সত্য, এক অদ্বৈত সত্তাকে উপলব্ধি করেছেন। সমস্ত ক্ষয়িষ্ণু ও পরিবর্তনশীল শক্তি ও মূল্যবোধের সম্মুখে তাই কবির অকম্পিত বাণী,—'শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক'।

পাশ্চাত্য দার্শনিক অভিব্যক্তিবাদ বা বিবর্তন-চেতনার মত উপলব্ধিও উপনিষদে আছে। বার্গসঁর 'প্রাণবেগের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার ফলে বিস্ফোরণ-ধর্মী বিবর্তন'-চিন্তার বহু আগে উপনিষদের কবিরা চিন্তা করেছিলেন, পরম কারণ বা আদি সত্তা বা ভগবান বিস্ফারিত হয়ে অভিব্যক্তি ঘটাতে ঘটাতে চলেছেন। 'তৈত্তিরীয়োপনিষদে' (২।৬) বলা হয়েছে,—

সোঽকাময়ত—বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা।
ইদং সর্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা। তদেবানুপ্রাবিশৎ।
(উদ্ধৃতি-ঐ)

অর্থঃ সেই পরমাত্মা কামনা করলেন. 'আমি বহু হব, আমি উৎপন্ন হব'। তিনি সৃষ্টি বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করলেন। তিনি জ্ঞানালোচনা করে সব কিছু সৃষ্টি করলেন। তিনি সৃষ্ট সব কিছুর অন্তরে প্রবেশ করলেন।

'ছান্দোগ্যোপনিষদে' (৬।২।৩) বলা হয়েছে.—

তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তদপোঽসৃজত (উদ্ধৃতি ৫ম উদ্বোধন সং,)।

অর্থ: উক্ত সৎ ঈক্ষণ করলেন. আমি বহু হব, প্রকৃষ্টরূপে জাত হব। তিনি তেজ সৃষ্টি করলেন। সেই তেজ ঈক্ষণ করলেন, আমি বহু হব, প্রকৃষ্ট রূপে জাত হব। উক্ত তেজ জল সৃষ্টি করলেন।

উপরিউক্ত স্থলসমূহে এবং উপনিষদের আরও বহুস্থানে সৃজনশীল বিবর্তন-চেতনার অনুরূপ চিন্তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই চিন্তার প্রভাব রবীন্দ্রমানসে অস্বীকার করা যায় না। এই চিন্তাই কবিকে অকারণ অবারণ গতির খুব কাছে নিয়ে গিয়েও আবার স্থির প্রত্যয় ও পরম গন্তব্যের অভিমুখে পরিচালিত করেছে।

গতির পরিণতিই শুধু স্থির গন্তব্যের অভিমুখে পদসঞ্চারী নয়, কবি উপলব্ধি করেছেন সকল গতির কারণ, সকল বিবর্তনের মূলে এক কেন্দ্রীয় স্থির পরম সত্য, এক অদ্বৈত সত্তা। কবির এই চিন্তার সঙ্গে পদার্থ বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বের মিল আছে। Potential Energy-কে যেমন আপাত গতিহীন মনে হয়, কিন্তু তার থেকেই অভিব্যক্ত হয় Kinetie Energy (যেমন ব্যাটারির অভ্যন্তরস্থ স্থির বিদ্যুৎ কোথাও আলোক রূপে, কোথাও তাপ রূপে, কোথাও শৈত্য রূপে, কোথাও যান্ত্রিক শক্তি রূপে অভিব্যক্ত), তেমনি বিশ্বের যাবতীয় গতি চেতনার কেন্দ্রে আছে স্থির Potential উৎস। বার্গসঁ-র Elan Vital বা প্রাণশক্তি সম্পর্কিত.চিন্তার সঙ্গে এই চিন্তার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। কবির মতে 'প্রেমই' সেই Potential উৎস। প্রেমই প্রেরণারূপে কেন্দ্রে অবস্থান করে সকল কিছুকে (ব্যক্তিসহ) ক্রিয়াশীল করে তোলে।

সমগ্র বলাকা কাব্যে নানা ভাবে এই গতির কথা রয়েছে। উদাহরণ দিয়ে আমাদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করা যাক।

প্রথমে অকারণ অবারণ উদ্দেশ্যহীন গতির কথা। আমাদের এই বিশ্বজগৎ চিরন্তন গতির মধ্য দিয়ে ক্রমঅভিব্যক্ত হয়ে চলেছে, এ-কথা জ্যোতির্পদার্থ বিজ্ঞান (Astrophysis)-এর কথা। এই বিশ্বাভিব্যক্তির কথা আলোচ্য কাব্যের 'চঞ্চলা' (৮ সংখ্যক) কবিতায়। স্থানের ত্রিমাত্রা ও কালের একমাত্রা দ্বারা গ্রথিত চতুর্মাত্রিক বিশ্বজগৎ এই কবিতায় নদীর রূপে সঙ্কেতিত (symbolised)। বিরাট বিপুল অবিচ্ছিন্ন প্রবহমানতার দ্বারা নদীর মতই এই বিশ্ব সচল সঞ্জীবিত এবং আবর্জনামুক্ত হয়ে আছে। নদীর তরঙ্গসমূহের পারস্পরিক সংঘর্ষে যেমন ফেনরাশি উত্থিত হয়, তেমনি এই গতিশীল বিশ্ব প্রবাহের আভ্যন্তরীন শক্তি (energy)-সমূহের পারস্পরিক সংঘাতে সৃষ্ট হয় বিপুল বস্তুপুঞ্জের—নীহারিকা নক্ষত্র-গ্রহ-উপগ্রহের; বুদ্বুদের মত উত্থিত হয় 'সূর্যচন্দ্রতারা যত' এবং বিশ্বপ্রবাহের ঘূর্ণাবর্তে তারা হয় ঘূর্ণমান,—

হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা ওঠে জেগে ;
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হতে ;
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্যচন্দ্রতারা যত
বুদ্‌বুদের মতো।

এই কবিতার মধ্যে কবি পাশ্চাত্ত্য-দর্শনাশ্রিত অকারণ এবং অবারণ গতির খুব কাছে এসে পৌঁছিয়েছেন। চঞ্চলাকে লক্ষ্য করে কবির উক্তি,—

হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিণী,
চলেছে যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিণী,
শব্দহীন সুর।
অন্তহীন দূর
তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া ?

নদীর গতির মত বিশ্বপ্রবাহের গতিময়তা বিশ্বকে নির্মল এবং অনাবিল রাখে, অপরিবর্তিত আবর্জনাস্তূপের অচল বিকারে বিশ্ব রুদ্ধ হয়ে যায় না। গতি আছে বলেই একই রূপের একঘেয়েমিতে বিশ্ব বদ্ধ না হয়ে নব নব রূপ-বৈচিত্র্যে অপূর্ব হয়ে উঠছে। এই গতির ফলেই বিশ্বে দেখা দেয় নব নব পৃথিবী, পৃথিবীতে দেখা দেয় নব নব ঋতু। গতির স্পর্শেই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নূতন জীবন হয় সম্ভাবিত।

কবি নিজের অন্তরেও এই বিশ্বজাগতিক গতি অনুভব করেছেন। 'অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা' কবিকে 'আজ করেছে উতলা' এবং কবি তাঁর নাড়ীতে নাড়ীতে চঞ্চলের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন। পশ্চাতের সর্বপ্রকার

বাধাকে অস্বীকার করে কবি এই গতির আহ্বানে সাড়া দিতে চান। নিজেকে লক্ষ্য করে কবির উক্তি,—

সম্মুখের বাণী
নিক তোরে টানি
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অতল আঁধারে—অকূল আলোতে।

এই পরিণতিহীন অভিব্যক্তির আরও পরিচয় ৩৬ সংখ্যক কবিতায়, যে কবিতাটির নামে সমগ্র কাব্যগ্রন্থটি পরিচিত। কবিতাটির নাম 'বলাকা'। এই নামটির মধ্যেও গতির অপূর্ব ব্যঞ্জনা—নামকরণ প্রসঙ্গে আমরা সে আলোচনা করেছি। কবি উপলব্ধি করেছেন, আপাত স্থির-প্রতীয়মান এই বিশ্বজগতের অন্তরালে গতির কেন্দ্রটি চিরন্তন রূপে সক্রিয়। বাইরে থেকে দ্রুত বোঝা না গেলেও ভিতরে ভিতরে গভীর পরিবর্তন চলেছে, এবং নব নব বিবর্তিত রূপগুলি দীর্ঘ কালসীমায় নিজেদের অভিব্যক্ত করছে। যাকে বাইরে থেকে স্তব্ধ বলে মনে হয়, তার অন্তরে থাকে 'বেগের আবেগ' বা Potential Energy। এই শক্তিই বাইরের Kinetic Energyরূপে অভিব্যক্ত হয়। এই 'বেগের আবেগে'র কেন্দ্রীয় তত্ত্বটি বার্গসঁর 'Elan Vital'-এর সঙ্গেও তুলনীয়। এরই প্রেরণায় জগতস্থ সব কিছুর অভিব্যক্তি। যে নক্ষত্রকে আপাত স্থির প্রতীয়মান হয়, আকাশের পটপ্রেক্ষায় তার মহা-অয়ন ছাড়াও তার থেকে বিকীর্ণ আলোক তরঙ্গও কি বিপুল গতিতেই না বিশ্ব-পরিভ্রমণরত। আলোকের এই তরঙ্গই বিশ্বের অন্ধকারকে কম্পমান করে তুলছে। কবি উপলব্ধি করেছেন, পৃথিবীর জল-স্থল-পাহাড়-অরণ্য ব্যাপ্ত করে যেমন চলেছে ভৌগোলিক বিবর্তন, তেমনি এই পৃথিবীর সকল জীব, মানুষ, মনুষ্য সভ্যতা, মনুষ্য সমাজও দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রম-পরিবর্তিত ও ক্রম-অভিব্যক্ত হতে হতে চলেছে। কোথায় কোন জৈব বীজ বা চিন্তার বীজ বা আদর্শের বীজ জন্মলাভ করে সকলের অলক্ষিতে উদ্গত-অঙ্কুর হয়ে কোন মহা বনস্পতির সম্ভাবনাকে দ্যোতিত করে চলেছে, সঙ্কীর্ণ কালসীমাবদ্ধ প্রাণীর কাছে তা তখনই ধরা পড়ছে না। কোন অস্পষ্ট সুদূর অতীতে মানুষের কত চিন্তা-ভাবাদর্শের জন্মলাভ। সেই চিন্তাভাবাদর্শ মনুষ্য সভ্যতায় অনজ থেকে তার নব নব

অভিব্যক্তি ঘটিয়ে তাকে সুদূর এখনও অস্ফুট ভবিষ্যতের দিকে পরিচালিত করছে নব রূপায়ণ লাভ করবার জন্য—

তৃণদল
মাটির আকাশ-'পরে ঝাপটিছে ডানা ;
মাটির আঁধার-নীচে, কে জানে ঠিকানা—
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।
দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি,
এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে।
শুনিলাম, মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।

কবির পরিণততর উপলব্ধি, কোথাও থামা যাবে না ; দীর্ঘ পথ পরিক্রমা-ক্লান্ত বিবর্তনপ্রবাহ, সমাজধারা, মনুষ্যসভ্যতা যখনই স্থিত হতে চাইছে, তখনই আভ্যন্তরীণ এবং বিশ্বস্থ গতির আবেগ (বা প্রাণ-প্রেরণা) তাকে নূতনভাবে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে,—

'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে !'

বহির্জাগতিক গতির কেন্দ্রে এই যে আপাত স্তব্ধ 'বেগের আবেগ' বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে আগেই বলেছি Potential Energy, তার আরও সুন্দর উদাহরণ ও ব্যাখ্যা রয়েছে ৬ সংখ্যক (ছবি) কবিতায়। এই কবিতায় কবি ব্যক্তি-মানুষের (কেবলমাত্র জৈব প্রাণী নয়) স্থির এই শক্তি-কেন্দ্রটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। ব্যক্তির সকল প্রকার স্বতস্ফূর্ত (যান্ত্রিক নয়) জীবন-অভিব্যক্তি, জীবন-ক্রিয়া ও জীবন-উপলব্ধির কেন্দ্রে যে স্থির শক্তি বা Vital Force অবস্থিত থেকে তাকে সকল কিছুতে উদ্দীপ্ত করে তুলছে, সেটি তার প্রেম-প্রেরণা। প্রেমই প্রেরণারূপে যখন জীবন-কেন্দ্রে অবস্থিত তখন

ব্যক্তির কাছে জগৎ ও জীবন, এই জীবনকর্মে অংশগ্রহণ, এই জীবনের পক্ক পরিক্রমা সব অপূর্ব সুন্দর হয়ে দেখা দেয়—প্রেম-প্রেরণার উৎসটিকে 'তুমি' বলে ডাক দিয়ে কবির বক্তব্য—

নয়ন সম্মুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই ;
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে,
তব সুর বাজে মোর গানে ;
কবির অন্তরে তুমি কবি,
নও ছবি, নও ছবি নও শুধু ছবি।

বিশ্বের কেন্দ্রেও আছে ঈশ্বরের প্রেম। তাই বিশ্বাভিব্যক্তির আর এক নাম ঈশ্বরের লীলা। এই কেন্দ্রীয় ঐশ্বরিক প্রেম-প্রেরণার ক্রিয়াতেই বিশ্ব বিচিত্র রূপের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়ে চলেছে। কবির নিজের জীবনও চলমান ও অর্থবহ হয়ে উঠেছে এই কেন্দ্রীয় প্রেমের স্থিতিশীল প্রত্যয়ে।

ব্যক্তিসত্তা শুধু এক আয়ুসীমাবদ্ধ নয়, জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়েও তার মহাপ্রয়াণ নবতর পরিণততর অভিব্যক্তির দিকে। এই চলমানতার স্রোত-প্রবাহে কত বাধা ; কত বিপত্তি, কত শৃঙ্খল এই গতিকে রুদ্ধ করতে চায়। কিন্তু আপন জীবন-আবেগে ব্যক্তিসত্তা তাকে অতিক্রম করে চলে যায়। কঠিনতম প্রস্তর-প্রাচীরও তার গতির আঘাতে চূর্ণ হয়ে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে। জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিসত্তার এই গতিময়তার পরিচয় রয়েছে ৭ সংখ্যক (সাজাহান) কবিতায়।

সবই গতিময়, তবুও ব্যক্তিমন তার সকল শ্রমের, সকল সৃষ্টির, সকল কৃতিত্বের, সকল অনুভূতির, সকল উপলব্ধির, সকল সাধনার ধ্রুব মূল্য অঙ্কিত করে রাখতে চায় পৃথিবীর বুকে। মানুষের সারা জীবনের সকল সুগভীর

সাধনা ও চরম উপলব্ধিও এই বিশ্বগতির প্রবাহে অস্থির ও অস্থায়ী হয়ে কোন অদৃশ্য লোকে মিলিয়ে যাবে, মানুষের কাছে এ অসহনীয়। তাই মানুষের চরম প্রচেষ্টা, তার কৃতিত্ব ও অনুভূতি-উপলব্ধিকে এমন কোন ধ্রুব মূল্যে অভিষিক্ত করা যায় কিনা, কালপ্রবাহ (Time) যাকে মূল্য দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে, তার স্থায়িত্বকে আঘাত করবে না। কিন্তু চরম আঘাতে মানুষ বোঝে যে তা হওয়ার নয়। কিন্তু তবুও ব্যক্তিসত্তার দুঃখ নেই। কারণ ব্যক্তিসত্তাও তো কোন চিরন্তন রূপবদ্ধ নয়। সেও তো পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নব নব জীবন পথে পরিভ্রমণশীল।

সম্রাট সাজাহান মনে করেছিলেন, তাঁর প্রিয়তমা মমতাজের প্রতি তাঁর সুগভীর প্রেমানুভূতির স্মৃতিকে তিনি পৃথিবীর প্রাঙ্গনে চিরন্তন করে রাখবেন, তাজমহল নামক স্মৃতিস্তম্ভের মধ্য দিয়ে। তাঁর সৃষ্ট তাজমহল স্মৃতিস্তম্ভকে তিনি তাঁর প্রেমের একটি পরিস্রুত কাব্যিক রূপায়ণে পরিণত করতে চেয়েছিলেন, যার মধ্য দিয়ে অনন্ত কাল ধরে মমতাজের প্রতি তাঁর অক্ষয় প্রেমের বাণী উচ্চারিত হবে,—

'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া'।

কিন্তু তাই কি সম্ভব? যে-মমতাজের স্মৃতি লক্ষ্য করে স্মৃতিস্তম্ভের অশ্রুত প্রেমবাণী প্রচার, সেই মমতাজের কানে আর সেই বাণী কোনদিন পৌঁছোবে না, কারণ মমতাজ চলে গিয়েছেন; চলমান এই পৃথিবীর বিভিন্ন সময়ের মানুষ, যারা এই স্মৃতিস্তম্ভের মহিমাকে উপলব্ধি করবে, তারাও কেউ নিত্যত্বের পরিচয়বাহী হয়ে চিরকাল টিঁকে থাকবে না। এবং যে-সাজাহান এই স্মৃতিস্তম্ভের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রেমের অক্ষয় পরিচিতি চিরস্থায়ী করতে চেয়েছিলেন, সেই সাজাহানও এই স্মৃতিস্তম্ভের আকর্ষণে পৃথিবীতে জড় হয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকেননি। সাজাহানের প্রেম, তাঁর প্রেমের স্মৃতি, তাঁর প্রিয়তমা, তাঁর বিপুল ঐশ্বর্য, কীর্তি ও খ্যাতি কিছুই তাঁকে চিরকালের মত ধরে রাখতে পারেনি এবং ঐ-সকল সামগ্রীও কিছু চিরন্তন নয়। নব নব জীবন পরিক্রমার মধ্য দিয়ে কোন দুর্লক্ষ্য ভবিষ্যতের দিকে সাজাহান-সত্তার মহাপ্রয়াণ আমরা জানিনা। হয় তো কিছুদিনের জন্য তাঁর স্থাপিত স্মৃতিস্তম্ভ একটি প্রেমের আদর্শের মত মমতাজ ও সাজাহানের কথা আমাদের মনে করাবে, কিন্তু নিরবধি কালের সীমাহীনতার তুলনায় তা নগণ্য। সর্বপ্রকার বাধা-

বন্ধন ও বন্ধুরতা অতিক্রমকারী ব্যক্তিসত্তার চিরচলমানতার ব্যঞ্জনা এই কবিতায়,—

যত দূর চাই
নাই নাই সে পথিক নাই।
প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ,
রুধিল না সমুদ্র পর্বত।
আজি তার রথ
চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বার পানে।

আগেই বলেছি, বলাকা কাব্যের গতিচেতনা প্রত্যক্ষত সমকালীন রাষ্ট্রীয় কার্য-কারণের ফলশ্রুতি। এই কাব্যরচনার কিছু পূর্বে বিশ্বের রাজনীতিক পটভূমিকা কবিমনে যে নবতর পরিবর্তন-চেতনার প্রেরণা সঞ্চার করেছিল, তার পরিচয় রয়েছে ৪ সংখ্যক (শঙ্খ), ৩৭ সংখ্যক (ঝড়ের খেয়া) এবং ৪৫ সংখ্যক (নববর্ষের আশীর্বাদ) কবিতায়। য়ুরোপের সর্বগ্রাসী সভ্যতার বীভৎস দংষ্ট্রাবিস্তার এবং য়ুরোপেতর মহাদেশগুলিকে আত্মসাৎ করবার তার নির্লজ্জ প্রয়াস কবিকে তীব্রভাবে আঘাত করেছিল। কবি উপলব্ধি করেছিলেন, য়ুরোপপ্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্রনীতিক অবস্থা যদি স্থায়ী স্থিতাবস্থায় পরিণত হয় এবং সারা পৃথিবীতে য়ুরোপের অপশাসন ও শোষণ যদি অব্যাহত থাকে, আর তার সঙ্গে বহু দিনাগত সামাজিক স্থিতাবস্থাও তার সকল সংস্কার, সঙ্কীর্ণতা, জীর্ণতা ও কলুষতা নিয়ে যদি অপরিবর্তিত হয়ে চলতে থাকে (বিশেষ করে আমাদের দেশের মত দেশে), তাহলে পৃথিবীর মানুষের পক্ষে বড় দুর্দিন। 'চঞ্চলা' কবিতায় কবি উপলব্ধি করেছিলেন, গতিময়তাই বিশ্বকে আবর্জনামুক্ত রাখে। সুতরাং রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রেও কবি এমন গতিময়তার আকাঙ্ক্ষা করছিলেন, যা পুরাতন সংস্কারবদ্ধ অত্যাচারলাঞ্ছিত পৃথিবীকে সর্বপীড়নমুক্ত আশাদীপ্ত নূতন 'উষার স্বর্ণদ্বার'-প্রান্তে পৌঁছিয়ে দেবে। ১৯১৪-র প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে বিধাতার কাছে কবির জিজ্ঞাসা, যে পরিবর্তন পৃথিবীর মানুষকে সকল অন্যায়-অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করবে, তাকে ঘোষণা করবে, অভ্যর্থনা করবে বিধাতার কে—

শঙ্খনাদ, সেই শঙ্খ আজ ধরিত্রীর ধুলায় পড়ে লাঞ্ছিত কেন? একি সহ্য করা যায়?

তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে,
কেমন করে সইব?
বাতাস আলো গেল মরে,
একি রে দুর্দৈব! (৪ সংখ্যক)

ঐ একই কবিতাতে কবি বিধাতার কাছে নূতন শক্তির জন্য প্রার্থনা করেছেন। কবি বিধাতার কাছে সেই শক্তি চেয়েছেন, যা সমস্ত মানুষকে পৃথিবীর নব পরিবর্তন আনতে উদ্বোধিত করবে; গতিহীন আরাম ও অলসতার জড়ত্ব থেকে মুক্ত করে নব নব আঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষকে নূতন আলোকিত পৃথিবীতে উত্তীর্ণ করিয়ে দেবে,—

তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব,
আঘাত খেয়ে অটল রব
বক্ষে আমার দুঃখে তব
বাজবে জয়ডঙ্ক!

রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে এই বিবর্তন চেতনা আরও তীব্ররূপে অভিব্যক্ত কবির ৩৭ সংখ্যক (ঝড়ের খেয়া) কবিতায়। যে অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার আর শোষণের রক্তাতাণ্ডবের মধ্যে পৃথিবীর উন্মত্ত পদবিক্ষেপ, তা থেকে মুক্তি বিবর্তনের অতি ধীরপন্থায় সম্ভব নয় বলে কবি উপলব্ধি করেছেন এবং স্বপ্ন দেখেছেন বিপ্লবের। কবি বুঝতে পেরেছেন, আমাদের বহুদিনের অতি পুরাতন পাপের জগদ্দল পাথর থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করবার জন্য প্রয়োজন সর্বাঙ্গীণ ও সার্বজনীন বিপ্লবের! উদাসীন হয়ে দূরে থেকে কোন লাভ নেই। তাই এই বিপ্লবের মৃত্যু-মহোৎসবে অকুতোভয়ে অংশ গ্রহণের জন্য কবি সমস্ত মানুষের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন,—

দূর হতে কী শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন—
ওই ক্রন্দকের কলরোল,
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল।
বহ্নিবন্যা তরঙ্গের বেগ,
বিষশ্বাসঝটিকার মেঘ,
ভূতল-গগন-
-মূর্ছিত বিহ্বল করা মরণে মরণে আলিঙ্গন—
ওরই মাঝে পথ চিরে চিরে
নূতন সমুদ্রতীরে
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি
ডাকিছে কাণ্ডারী,
এসেছে আদেশ—
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মত হল শেষ,
পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা-কেনা
আর চলিবে না।

পুরাতন পাপ থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করবার জন্য কবি যে-বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছেন, তার সামনে অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন; অনেক অন্ধকারাবৃত রাত্রি, অনেক মেঘপুঞ্জিত ঝঞ্ঝা-উৎক্ষিপ্ত প্রান্তর, অনেক ফেন-উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ-গর্জিত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে, অনেক সঙ্কোচ, বহু মৃত্যু, ধ্বংস এবং প্রিয়জনের বিচ্ছেদ-বেদনা অতিক্রম করে বিপ্লবোত্তর সার্থকতার স্বর্ণদ্বারপ্রান্তে পৌঁছোনো যাবে। আরাম সুখ বিসর্জন দিয়ে নূতন জীবনপ্রান্তে পৌঁছোনোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে তবেই জাতির জীবনে সেই নূতন প্রভাতের সূচনা হবে।

এই কবিতাতেই কবির অকারণ অবারণ গন্তব্যহীন নিরুদ্দেশ গতি সম্পর্কে সংশয় দেখা দিয়েছে। যে গতি পরিণতিতে কোন সার্থকতার প্রান্তস্পর্শী নয়, কোন পূর্ণতার তীর্থ-অভিযাত্রী নয়, সে গতি অর্থহীন। যে-বিপ্লব শুধু অসংখ্য মৃত্যু-পরিকীর্ণ, অথচ পরিণতিতে কোন শ্রেয়, কল্যাণচিহ্নিত, মঙ্গলময় গন্তব্যের দিকে পদসঞ্চারী নয়, যা শুধু পরিবর্তনের একটি পর্যায় মাত্র, কোন স্থিরপ্রত্যয়ের, ধ্রুব অস্তিত্বের স্বর্গলোক-উত্তীর্ণ নয়, সেই বিপ্লব,

সেই মৃত্যু-লাঞ্ছনা অর্থহীন অকারণ নির্বোধ উন্মত্ততা মাত্র। গন্তব্যহীন যে-গতিচেতনা পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান-দর্শনের মর্মমূলে, কবি শেষ পর্যন্ত সেই অকারণ গতিতে আস্থাহীন। কবির বিপ্লবচেতনা কল্যাণময় পরিসমাপ্তিতে বিশ্বাসী। বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বহু মৃত্যুর মূল্যে যেখানে আমরা পৌঁছোতে চাই, ধ্রুব মঙ্গল এবং শাশ্বত কল্যাণ সেখানে আছে বলেই না আমরা চাই, তার জন্যেই না আমাদের প্রাণদান,—

তোর চেয়ে আমি সত্য, এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব দেখ্।
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।

বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আমরা এই সত্যে পৌঁছুতে চাই। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চাই মৃত্যু-অতীত অমৃতের স্থির সার্থকতা। অন্ধকারের মধ্যে বসে আমাদের সকল তপস্যা দিবা-দীপ্ত অকম্পিত প্রত্যয়ের সার্থকতায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য। নচেৎ সব বিপ্লব ব্যর্থ, সব মৃত্যু অর্থহীন—

বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা,
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্তসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?

কিন্তু পাশ্চাত্ত্য চেতনার মূলকথা, বিবর্তন তথা বিপ্লব একটা স্থায়ী পদ্ধতি, eternal Process, এবং কোথাও তার সমাপ্তি নির্দেশিত নয়। অতএব রবীন্দ্র-গতিচেতনার সঙ্গে তার পার্থক্য স্বত-প্রকাশ।

পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক প্রভাব নয়, শেষ পর্যন্ত কবি যে উপনিষদের প্রত্যয়েই প্রতিষ্ঠিত, আলোচ্য কবিতাটি তারই পরিচায়ক।

কবির গতিচেতনার আরও পরিচয়, এই কাব্যগ্রন্থের মানবচেতনাশ্রিত কবিতাবলী (১৭, ২৮ এবং ২৯ সংখ্যক কবিতা) এবং নবীনবরণের

কবিতাবলীতে (১, ২, ৩, ৪, ৩৭ ও ৪৫ সংখ্যক কবিতা)। মানুষকে কবির শ্রদ্ধা জানানর অন্যতম কারণ মানুষ বিবর্তনধারার সাম্প্রতিকতম পরিণতি। আর নবীনকে কবি বরণ করেছেন, কারণ নবীনই পুরাতনের জীর্ণ ধমনীতে নূতন রক্ত সঞ্চারিত করতে পারে। সেই তো পরিবর্তনের অগ্রদূত। এ-বিষয়ে পরবর্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য।

এমনই ভাবে সমস্ত কাব্যগ্রন্থখানি গতিচেতনার পরিচয় নিয়ে এসেছে। আলোচনার বাইরে যে সকল কবিতা রইলো, তাদের অধিকাংশও পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষে কবির এই বিশিষ্ট মানসিকতাকেই নানা দিক দিয়ে ধারণ করে আছে।

[চার]

'বলাকা'র মানবচেতনা

রবীন্দ্রনাথের জীবনচেতনা তিনটি কেন্দ্রীয় প্রত্যয়ের সমন্বয়ের ফল। এই ত্রয়ীপ্রত্যয় যথাক্রমে তাঁর মানবপ্রীতি, প্রকৃতিপ্রীতি ও ঈশ্বরপ্রীতি; কিংবা বলা যেতে পারে উক্ত তিনটি প্রীতি একই কেন্দ্রীয় প্রত্যয়ের ত্রয়ীঅভিব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের প্রাথমিক সর্ত তাঁর সুগভীর মানবপ্রেম। মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসাই তাঁর কাব্যচেতনার প্রধান নিয়ামক। বাল্য থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত কবির সকল সাহিত্যের অন্তরালস্থিত প্রেরণারূপে বিরাজিত থেকেছে তাঁর গভীর মানবিক ভালবাসা। এই ভালবাসা কোন 'ইজ্‌ম্‌' বা তত্ত্বের উদাহরণরূপে তাঁর কবিমানসে প্রতিষ্ঠিত নয়; এ সহজাত, স্বত-উৎসারিত। আবেগ এবং যুক্তি, উভয় উৎস থেকেই এই ভালবাসার প্রাণধারা আহৃত। এই মানবপ্রীতি তাঁর জীবনের সর্বাঙ্গ ব্যাপ্ত করে যে কি গভীর প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত, শেষ জীবনে মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে কবির অকুণ্ঠ স্বীকৃতিতে তার পরিচয়,—'আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে মুক্তি পরমপুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।···

'আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে, এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা,—তাঁরি বেদীমূলে নিভৃতে

বসে আমার অহংকার আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।' এবং, 'শঙ্খঘণ্টা বাজিয়ে যাঁরা আমাকে উচ্চ মঞ্চে বসাতে চান, তাঁদের আমি বলি, আমি নিচেকার স্থান নিয়েই জন্মেছি; প্রবীণের প্রধানের স্থান থেকে খেলার ওস্তাদ আমাকে ছুটি দিয়েছেন। এই ধুলো মাটি ঘাসের মধ্যে আমি হৃদয় ঢেলে দিয়ে গেলাম, বনস্পতি-ওষধির মধ্যে। যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটির হাতের মানুষ, যারা মাটিতে হাঁটতে আরম্ভ ক'রে শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে, আমি তাদের সকলের বন্ধু—আমি কবি।'

বিদায়ের কিছু আগে এই ধরণীর মানুষকে লক্ষ্য করে তাঁর একান্ত কামনা,—

সেতারেতে বাঁধিলাম তার,
গাহিলাম আরবার,
'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
আমি তোমাদেরি লোক,
আর কিছু নয়—
এই হোক শেষ পরিচয়॥' (পরিচয়/সেঁজুতি)

কবির মানবপ্রেমের বিচিত্র বিকাশ আমরা দেখেছি তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যের মধ্যে। ছোট গল্পসমূহে, প্রবন্ধে, উপন্যাসে গভীরতম মানবিক সহানুভূতির অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয়-চিহ্নিত চিত্র রচিত হয়েছে। অবহেলিত অত্যাচারিত মানুষের প্রতি তাঁর সুগভীর ভালবাসা এবং অত্যাচারীর প্রতি তীব্র রোষ ও ঘৃণার পরিচয় তাঁর কাব্যের স্বল্পস্থান জুড়ে নেই। তাঁর প্রায় সমস্ত কাব্যেই মানবপ্রেমের পরিচয়। তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য চিত্রা, চৈতালি, গীতাঞ্জলি, পলাতকা, পরিশেষ, শেষ সপ্তক, পত্রপুট, সেঁজুতি, জন্মদিনে। মানুষের অত্যাচারীর প্রতি তীব্রতম ধিক্কার ব্যক্ত হয়েছে তাঁর পত্রপুট কাব্যে। রাষ্ট্রীয় পরিপ্রেক্ষায় অত্যাচারীর স্বরূপ উদ্ঘাটন 'কালান্তর' প্রবন্ধ সংগ্রহে। 'সভ্যতার সংকট' নামক প্রবন্ধে মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে মানুষের প্রতি কি গভীর ভালবাসারই না পরিচয়! মৃত্যুর প্রায় বছর তিনেক আগে লেখা 'জন্মদিনে' (সেঁজুতির অন্তর্ভুক্ত) কবিতায় কি অকুণ্ঠ চেতনায় না সভ্যতার অপহ্নবকারী অত্যাচারীর পরিচয় উদ্ঘাটন, আবার তারই সঙ্গে অত্যাচারীর কলঙ্কমুক্ত নিষ্কলুষ ভবিষ্যতের প্রতি গভীর আস্থা জ্ঞাপন,—

শুনি তাই আজি
মানুষ-জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি।

... ...

মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব, ব'লে যাব—এ প্রহসনের
মধ্য-অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের ;
নাট্যের কবররূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।
বলে যাব, দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।

বলাকা কাব্যের মধ্যেও কবির মানবিক চেতনা অকুণ্ঠ প্রত্যয়ে উদ্ভাসিত। মানবিক চেতনার প্রকাশ এই কাব্যে তিন ভাবে ঘটেছে। একদিকে যুগ-যুগান্তর ধরে লাঞ্ছিত মানবাত্মার মুক্তির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে বিশ্ব-বিবর্তনের আধুনিকতম (latest) পরিণতিরূপে মানুষকে স্বীকৃতি দান, এবং তৃতীয়ত, সর্ববিধ আভ্যন্তরীন বৈশিষ্ট্যে মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিরূপ রূপে উপলব্ধি। অত্যাচারীর প্রতি ধিক্কার নয়, আত্মশক্তির জাগরণের জন্য অত্যাচারিতকে প্রেরণা দান,—এই কাব্যের মানবিক চেতনার বৈশিষ্ট্য।

একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, প্রাক্-বলাকা রবীন্দ্রকাব্যের মানবিক সহানুভূতি তথা মানবপ্রেম কবির অনুভূতি-নির্ভর এবং আবেগের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত। কিন্তু বলাকা ও বলাকা-উত্তর রবীন্দ্রকাব্যের মানব-চেতনা বুদ্ধিদীপ্ত। মাতার মত সন্তানকে শুধু ভালবাসা নয়, মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকে কবি এই কাব্যে যুক্তির পথে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তাকেই প্রকাশ করেছেন অকম্পিত লেখনীতে। কবির প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধসমূহের মধ্যে মানবিক চেতনা যেমনভাবে ধরা পড়েছে, এই কাব্যের মানব-চেতনা তারই সহধর্মী। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কবি তাকে কাব্যসৌন্দর্যে মণ্ডিত করে প্রকাশ করেছেন।

আগেই বলেছি, কবির মানব-চেতনা এই কাব্যে তিনভাবে প্রকাশিত। প্রথমত, দীর্ঘদিন ধরে শক্তিমানের দ্বারা এবং বহুযুগাগত সংস্কারের দ্বারা যে-মানুষ লাঞ্ছিত হয়েছে, তার মুক্তি কামনা অতি তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে এই

কাব্যের কয়েকটি কবিতায়। এই চেতনা আরও বিশিষ্টতা লাভ করেছে সমকালীন রাষ্ট্রনীতিক পটভূমিতে। একদিকে বহু যুগাগত সংস্কার মানুষের সুস্থ মানসবিকাশকে স্তব্ধ করে দিয়েছে, অপরদিকে পৃথিবীর শক্তিমান জাতি-সমূহ দুর্বল জাতির উপর নিপীড়নের রথচক্র পরিচালিত করেছে। একদিকে প্রবলের উদ্ধত অন্যায় এবং লোভীর বীভৎস লোভ এবং অপরদিকে ভীরুর ভীরুতা ও বঞ্চিতের ক্ষোভ—এই দুইয়ের সংঘর্ষে পৃথিবীর মানব-সভ্যতা মৃত্যু-পথযাত্রী হয়েছে। এই নাগপাশ থেকে মানবমুক্তির ও বিপ্লবের বাণী তীব্র উদ্দীপনায় প্রকাশিত ৪, ৩৭ ও ৪৫ সংখ্যক (শঙ্খ, ঝড়ের খেয়া ও নববর্ষের আশীর্বাদ) কবিতায়। ঝড়ের খেয়ায় কবির বাণী,—

ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি-অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান—
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।

কবির মানবিকতার মূল ভিত্তি অত্যাচার-লাঞ্ছিত মানুষের প্রতি গভীর আন্তর সহানুভূতিতে এবং অত্যাচারীর প্রতি তীব্র ধিক্কারে। অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য কবির ডাক উক্ত কবিতার প্রথম দুই স্তবকে। গতিতত্ত্ব প্রসঙ্গে এর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে। সেই আলোচনা থেকেই কবির মানবচেতনার এই দিকটি বুঝতে পারা যাবে। পুনরায় সে আলোচনা নিরর্থক।

দ্বিতীয়ত, কবি মানুষকে তাঁর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, কারণ মানুষ বিবর্তন ধারার সাম্প্রতিকতম (latest) পরিণতি। বলাকা গতিবাদের কাব্য। এই কাব্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-বিবর্তন, জৈব-বিবর্তন এবং সমাজ-বিবর্তনের এক প্রগাঢ় ইঙ্গিত দিয়েছেন। বিবর্তনের পথে জড়বিশ্ব ক্রম-অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে 'প্রাণে' এসে পৌঁছিয়েছে এবং প্রাণ দীর্ঘ বিবর্তন পথে ভাইরাস্, মোল্ডস্, এক্টিনোমাইসেট্স্, ব্যাকটেরিয়ার মধ্য দিয়ে এককোষী আদ্যপ্রাণী (Protozoa), তার থেকে বহুকোষী প্রাণী এবং তারপর মেরুদণ্ডী প্রাণীতে এসে পৌঁছিয়েছে।

মেরুদণ্ডী প্রাণীরও বিবর্তন চলেছে যথাক্রমে মৎস্য, উভচর, সরীসৃপের মধ্য দিয়ে,—এবং এসে পৌঁছিয়েছে স্তন্যপায়ী ও পাখীতে। স্তন্যপায়ীর চরমতম পরিণতি বুদ্ধিশীল মানুষ (Homo Sapiens)। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকের মতো রবীন্দ্রনাথের শেষ বিশ্বাস এই নয় যে, বিশ্ববিবর্তন অকারণ এবং অবারণ। তাঁর মতে বিবর্তনের কেন্দ্রীয় শক্তি একটি চরম অভিব্যক্তির দিকে বিশ্বকে পরিচালিত করছে। সেই অভিব্যক্তিরই আধুনিকতম সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন করে দেখা দিয়েছে মানুষ। উপনিষদের কবির মতো রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন, মানুষের অভিব্যক্তি হলো বলেই, বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বরের একাকীত্ব থেকে মুক্তি ঘটলো। 'এক আমি বহু হব—বিরাট আমি বিচিত্র হব',—বিশ্বের কেন্দ্রীয় শক্তির এই যে অন্তর্লীন আকূতি, তা সার্থকতায় বিধৃত হলো মানুষের উদ্ভবে কারণ বিপুল বিশাল প্রাণহীন জড়পিণ্ডসমূহ বা অনুভূতি-উপলব্ধিহীন মনুষ্যেতর জৈব-জগৎ, কিছুই ঈশ্বরের একাকীত্ব দূর করতে পারে না। কারণ একাকীত্ব দূরের জন্য দরকার সহমর্মিতা, অনুভূতিহীনের কাছে তা প্রাপ্তব্য নয়। মানুষ অনুভূতি সম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান, তাই তার কাছে ঈশ্বরের মহত্ত্ব ধরা পড়ে। এই বিপুল সৃষ্টির সৌন্দর্য, সার্থকতা, অপূর্বতা, রহস্যময়তা একমাত্র মানুষের কাছেই উপলব্ধীকৃত হয়। পাঠক ছাড়া যেমন কাব্য অর্থহীন, এই বিশ্বকাব্যের পাঠক মানুষ ছাড়াও তেমনি এই বিশ্ব অর্থহীন। এর বিপুলায়তন কিন্তু জড় নীহারিকা, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, পাহাড়-পর্বত, কান্তার-বনানী, সমুদ্র-প্রান্তর কিছুরই কোন মূল্য নেই, যতক্ষণ না তারা মনুষ্যচেতনা দ্বারা অভিসিঞ্চিত। তাইতো মানুষের সার্থকতা, তার মূল্য। কবির কল্পনা,—শুধু আমাদের এই পরিচিত পৃথিবীতেই নয়, মানুষের আগমন সম্ভাবিত করবার জন্য বিবর্তন চলেছিল গ্রহে গ্রহে, জগতে জগতে। এই মানুষের আগমন সম্ভব করবার জন্যই বিশ্বের বিপুল পরীক্ষাশালায় (laboratory-তে) পরীক্ষা চলছিল। জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে, বিচিত্র রূপের মধ্য দিয়ে, উদ্ভিদ থেকে প্রাণীর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে, পুষ্প-পত্র ও প্রাণীজগতের বিচিত্র অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে সব পথ এই দিকেই চলেছিল। সেই পথের সার্থক তীর্থ মানুষ, বিশ্বের অভিব্যক্তির আধুনিকতম অ-পূর্ব পরিণাম। তাই কবি মানুষকে শ্রদ্ধা জানান। কবির মানব-চেতনার দ্বিতীয় কারণ এইটি। মানুষেরও সার্থকতা এই বিশ্ব তথা বিশ্বস্রষ্টাকে উপলব্ধিতে। আপন জীবনযাত্রার প্রাচীরবদ্ধ মানুষ সব সময় বিশ্বস্রষ্টার এই মহত্ত্বকে উপলব্ধি করতে পারে না। তার জন্যই তাকে

বরণ করতে হয় সাধনার অপরিসীম কষ্ট। সরাতে হয় অনেক সংস্কারের অবগুণ্ঠন। সেই সাধনার সিদ্ধিতেই মানুষের সার্থকতা। এবং সেই পরিচয়-গর্ভ মানুষের প্রতিই কবির শ্রদ্ধা নিবেদন। বিশ্বস্রষ্টাকে লক্ষ্য করে তাই মানুষের প্রতিনিধিরূপে কবির উক্তি,—

যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে তো হয়নি তোমার দেখা।
সেদিন কোথাও কারও লাগি ছিল না পথ-চাওয়া ;
... ...
আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম—
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দকুসুম।
আমায় তুমি ফুলে ফুলে
ফুটিয়ে তুলে
দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে।
আমায় তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে।
আমায় তুমি মরণ-মাঝে লুকিয়ে ফেলে
ফিরে ফিরে নূতন করে পেলে।

এবং,

আমার চোখে লজ্জা আছে, আমার বুকে ভয়,
আমার মুখে ঘোমটা পড়ে রয় ;
দেখতে তোমায় বাধে ব'লে পড়ে চোখের জল।
ওগো আমার প্রভু,
জানি আমি, তবু
আমায় দেখবে ব'লে তোমার অসীম কৌতূহল—
নইলে তো এই সূর্যতারা সকলই নিষ্ফল। (২৯/তুমি আমি)

এই কাব্যের মানবিক চেতনার তৃতীয় কারণ,—কবির কাছে মানুষই একমাত্র ঈশ্বরের সমবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। বিবর্তনের ফলে মানুষ এমন এক স্থানে এসে পৌঁছিয়েছে, প্রকৃতি জগৎ এবং মনুষ্যেতর জৈবজগৎ যার কোন নাগালই পায় না। ক্রম-অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে মানুষ এমন সব গুণের অধিকারী হয়েছে, যা একমাত্র বিধাতাতেই সম্ভব। ১৭ সংখ্যক (প্রেমের পরশ) এবং ২৮ সংখ্যক

(দেনা-পাওনা) কবিতার মধ্যে কবির আলোচ্য চেতনার প্রকাশ। কবির উপলব্ধি—প্রাণী জগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষম-প্রজ্ঞায়' (creative genius-এ) এবং অনুভূতি শক্তি তথা তার সর্বোত্তম বিকাশ প্রেমানুভূতিতে। এই বিশ্বে মনুষ্যেতর আর কোথাও (একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া) এই ক্ষমতা নেই। এই জগতে জড় বস্তুসমূহ যে-সকল বৈশিষ্ট্যের (properties) অধিকারী এবং মনুষ্যেতর জীবজগৎ প্রকৃতির কাছ থেকে সহজাত বৃত্তি (instincts)-রূপে যে গুণাবলীর অধিকারী, ততটুকুই মাত্র সে প্রকাশ করতে পারে। তার বেশী পারে না। কিন্তু মানুষ পারে। প্রকৃতিদত্ত বা বিধাতাদত্ত উপকরণের সাহায্যে সে সম্পূর্ণ অভূতপূর্ববস্তু সৃষ্টি করবার প্রতিভার অধিকারী এবং তার ফলে সৃষ্টিকর্তার সমান ক্ষমতাসম্পন্ন। এই বিশ্বকে সৃষ্টি করেছিলেন বিধাতা; এর কোন অনুরূপ ছিল না। এ অপূর্ব। তিনি তাই স্রষ্টা। মানুষ অবশ্য উপকরণগুলি ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছে বটে, কিন্তু তারই সাহায্যে সেও যা রচনা করে তা নব সৃষ্টি হয়ে ওঠে। তারও কোন তুলনা মেলে না। তাই মানুষ বিধাতা-তুল্য, সেও স্রষ্টার আসনের অধিকারী। মানুষের প্রতিনিধিরূপে 'দেনা-পাওনা' কবিতায় বিধাতার কাছে কবির নিবেদন,—

পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান,
তার বেশি করে না সে দান।
আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশি করি দান,
আমি গাই গান।
বাতাসেরে করেছ স্বাধীন,
সহজে সে ভৃত্য তব বন্ধনবিহীন।
আমারে দিয়েছ যত বোঝা
তাই নিয়ে চলি পথে, কভু বাঁকা, কভু সোজা—
একে একে ফেলে ভার মরণে মরণে
নিয়ে যাই তোমার চরণে
একদিন রিক্ত হস্ত সেবায় স্বাধীন;
বন্ধন যা দিলে মোরে করি তারে মুক্তিতে বিলীন।

পূর্ণিমারে দিলে হাসি ;
সুখস্বপ্নরসরাশি
ঢালে তাই ধরণীর করপুট সুধায় উচ্ছ্বাসি।
দুঃখখানি দিলে মোর তপ্ত ভালে থুয়ে,
অশ্রুজলে তারে ধুয়ে ধুয়ে
আনন্দ করিয়া তারে ফিরায়ে আনিয়া দিই হাতে
দিনশেষে মিলনের রাতে।

মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন এবং হৃদয়প্রধান জীব। এবং এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই প্রাকৃতিক স্বতঃ-বিবর্তন ছাড়াও মনুষ্যসমাজ আপন প্রচেষ্টায় নব নব অভিব্যক্তির মধ্যে সার্থকতার পথ অনুসন্ধান করছে। প্রাণীজগতে বেঁচে থাকবার জন্য যে জীবন-সংগ্রাম, মানুষের জগতেও তা কিছু কম নয়। কিন্তু জীবন সংগ্রামের এই পরিশ্রম-যন্ত্রণাকে অতিক্রম করে দীর্ঘ বেদনা ও সাধনার মধ্য দিয়ে মনুষ্য-সভ্যতা নূতন সার্থকতার পথ অনুসন্ধান করে চলেছে। মানুষ সকল বেদনাকে সাধনার মধ্য দিয়ে এক অপূর্ব আনন্দে পর্যবসিত করতে পেরেছে। সহজাত বৃত্তিতে পশুপক্ষী যেখানে স্বভাবতই সীমাবদ্ধ, মানুষ সেখানে নিজের নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার দ্বারা সম্পূর্ণ নূতন জিনিস সৃষ্টি করেছে। স্বরকে সে পরিণত করেছে সঙ্গীতে, শব্দকে পরিণত করেছে সাহিত্যে, রেখাকে পরিণত করেছে চিত্রে, বেদনাকে পরিণত করেছে আনন্দে, শূন্যকে পৌঁছিয়ে দিয়েছে পূর্ণের চরণ-প্রান্তে। জন্ম মুহূর্তে প্রকৃতির পরাধীনতম এবং সর্বাপেক্ষা অসহায় ও দুর্বল জীব মানুষ পরিণতিতে সর্বাপেক্ষা শক্তিধর ও স্বাধীন। জাগতিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সর্বপ্রকার শৃঙ্খলকে সরিয়ে দিয়ে মনুষ্য সভ্যতাকে বিপুল সার্থকতার প্রান্তে পৌঁছিয়ে দিয়েছে মানুষ তার শত সহস্র বৎসরের সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও সামাজিক সাধনার দ্বারা। মনুষ্য-উদ্ভবের প্রথম যুগের সেই ভয়ঙ্কর, প্রচণ্ড, রুদ্র ধরিত্রী মানুষের সচেতন প্রচেষ্টায় আজ মানুষের আনন্দময় স্বর্গলোকে পরিণত। মানুষ স্রষ্টা, তাই কবির কাছে মানুষ শ্রদ্ধেয়, প্রণম্য।

অনুভূতিশক্তি (feeling) এবং উপলব্ধি ক্ষমতা (cognition)-তেও মানুষ ঈশ্বরের সমান। আবার অনুভূতিশক্তির সার্থকতম বিকাশ প্রেমানুভূতিতে। মানুষ ছাড়া আর কোন কিছুরই এই শক্তি নেই। তাই মানুষ যদি সৃষ্ট না হতো, তা হলে ঈশ্বর-সৃষ্ট এই বিপুল বিশ্বের ধারণাতীত বৈচিত্র্য কোথাও কোন সার্থক মূল্যে স্বীকৃত হতো না। মানুষ নিজের উপলব্ধি ক্ষমতার দ্বারা

এই বিশ্বের সৌন্দর্য উপলব্ধি করেছে, অনুভব করেছে এর অপূর্ব বৈচিত্র্য এবং প্রেমানুভূতিতে এর সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করেছে, একে ভালোবেসেছে। বিশ্বের প্রতি এই ভালবাসা বিশ্বস্রষ্টার প্রতি ভালবাসায় পরিণত হয়েছে। তাই এই বিশ্বে মানুষের আবির্ভাব যদি না হতো তাহলে বিপুল বিশাল প্রজ্বলন্ত ও নির্বাপিত বস্তুপিণ্ডসমূহ এবং চেতনা, অনুভূতি ও উপলব্ধিহীন জৈবজগৎ নিয়ে সেটি একটি অর্থহীন, মূল্যহীন অপচয়ের পরিচায়ক হয়ে থাকতো। স্রষ্টা ও সৃষ্টির সার্থকতা অনুপলব্ধ থেকে যেতো। ঈশ্বর নিজের সৃষ্টির মূল্য ও সার্থকতার আনন্দ উপভোগ করতে পারতেন না। মানুষের আবির্ভাবেই এবং ঈশ্বরের প্রতি মানুষের প্রেম নিবেদনেই ঈশ্বর এই আনন্দ উপভোগ করতে পারছেন। তাই সকল মানুষের হয়ে কবির বক্তব্য,—

হে ভুবন
আমি যতক্ষণ
তোমারে না বেসেছিনু ভালো
ততক্ষণ তব আলো
খুঁজে খুঁজে পায় নাই তার সব ধন।
ততক্ষণ
নিখিল গগন
হাতে নিয়ে দীপ তার শূন্যে শূন্যে ছিল পথ চেয়ে।

মোর প্রেম এল গান গেয়ে
কী যে হল কানাকানি,
দিল সে তোমার গলে আপন গলার মালাখানি।
মুগ্ধ চক্ষে হেসে
তোমারে সে
গোপনে দিয়েছে কিছু যা তোমার গোপন হৃদয়ে
তারার মালার মাঝে চিরদিন রবে গাঁথা হয়ে। (১৭ সংখ্যক)

মানুষের এই প্রেমানুভূতিই কবির কাছে মানবশ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম প্রধান কারণ বলে মনে হয়েছে। এমনি ভাবে এই কাব্যে বিভিন্ন দিক দিয়ে কবি মানুষকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন; তাকে উদ্বোধিত করেছেন; অকুণ্ঠ স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর মানবচেতনার, মানবিক প্রত্যয়ের।

[পাঁচ]

যৌবনের জয়গান

বলাকা গতিবাদের কাব্য। গতিই জীবনকে সচল রাখে, উজ্জ্বল রাখে। গতিহীনতা, স্থবিরত্ব, স্থাবরত্ব, মৃত্যুর অগ্রদূত। কি বিশ্বজাগতিক নিয়মের ক্ষেত্রে কি সামাজিক-রাষ্ট্রিক নিয়মের ক্ষেত্রে বা মানব-সভ্যতার ক্ষেত্রে, এই গতিই বারবার নবজীবন-স্পন্দন সৃষ্টি করে। দীর্ঘ দিনের অনড় সংস্কার মানুষের সকল কল্যাণকে রুদ্ধ করে রাখে। গতিহীন নদী যেমন বদ্ধ, পঙ্কিল, আবর্জনাসর্বস্ব, গতিহীন রাষ্ট্র, সমাজ ও সভ্যতাও তেমনি বিকৃতির বদ্ধ পঙ্কে মৃত্যুপথযাত্রী। তাই জীবনকে নূতনত্ব দান করবার জন্য, রাষ্ট্রকে লোভমত্ততার বদ্ধ পঙ্ক-পল্বল থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য, সমাজকে অপসংস্কার থেকে মুক্ত করবার জন্য, সভ্যতাকে নব নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য, এদের সবকিছুর মধ্যে গতি সঞ্চার করা দরকার। এবং এ-কাজ সম্ভব সেই সব কিশোর, যুবক, নবীনদের দ্বারা যারা যৌবনস্পর্শে দেহ-মনে চলতার অধিকারী, প্রবীণতার তর্ক-যুক্তিভারে যাদের জীবনের গতিপথ বাঁধা সড়কের উপর সঞ্চারমান নয়, যারা নতুনকে পরীক্ষা ও গ্রহণ করতে অকুতোভয়। তাই গতিবাদের এই কাব্যে কবি নবীনদের আহ্বান করেছেন নূতন জীবন-রথাশ্বের বল্গা ধারণ করবার জন্য, বরণ করেছেন সবুজকে নব অভিযানে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করতে। যৌবনের জয়গানে তাই এ-কাব্য মুখর।

কবির যৌবন-চেতনার একটি পটভূমি আছে। বলাকা-পূর্ব কবিজীবনে একটি সংশয়ের পর্ব এসেছিল। তার থেকে মুক্তির জন্য গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালিতে কবি আধ্যাত্মিক জগতের আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু সম্ভবত কালক্রমে কবি অনুভব করতে সুরু করেছিলেন, আধ্যাত্মিক শান্তি তাঁকে ক্রমশ জড়-নিষ্ক্রিয় শান্তির দিকে পরিচালিত করছে। সেই স্থবিরত্ব থেকে মুক্ত হয়ে কবি আবার নবযৌবনের সক্রিয়তা ও কর্মচঞ্চলতার অধিকারী হতে চেয়েছেন। আর তার ফলেই বলাকায় নবীনবরণ ও যৌবনের জয়গান।

তা-ছাড়া কবি বলাকা-রচনার পূর্বে দীর্ঘকাল য়ুরোপ-আমেরিকা ভ্রমণ করেছিলেন। এই ভ্রমণও কবিমানসে নবতর যৌবনচেতনা ও নবীনবরণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা সঞ্চারিত করেছিল। এ-বার য়ুরোপে গিয়ে পাশ্চাত্ত্যের বিপুল ও

তীব্রস্রোত জীবনরসধারায় নিজেকে পরিপূর্ণ করে তিনি ফিরেছিলেন, অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী মহাশয় আমাদের এ বিষয়ে অবহিত করেছেন। পাশ্চাত্য জীবনধারার এই গতিময়তা একদিকে কবিকে গতিচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং অপরদিকে এই গতিকে গ্রহণ ও ধারণ করবার জন্য নবীন-বরণে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। কবি অনুভব করেছিলেন, জাগ্রত যৌবনই এই নবজীবনের ও নবীন পৃথিবীর ভগীরথ। যৌবনের জয়গানের মধ্য দিয়ে কবি সেই সবুজ কিশলয়কে আপন শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করলেন।

সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নবীনবরণ ও যৌবনের জয়গানের পরিচয় রয়েছে এই কাব্যের ১, ২, ৩, ৪, ৩৭, ৪৪ ও ৪৫ সংখ্যক (সবুজের অভিযান, সর্বনেশে, আহ্বান, শঙ্খ, ঝড়ের খেয়া, যৌবন, নববর্ষের আশীর্বাদ) কবিতায়। প্রথম কবিতাটিতেই ভারতীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের দীর্ঘদিনবাহিত রুদ্ধস্রোত জলাশয়ের পঙ্কমুক্তির জন্য ও তাতে আবার নবীনস্রোত প্রবাহিত করবার জন্য কবি ডাক দিয়েছেন নবীনদের। এই নবীন অন্ধ বিশ্বাসে সবকিছু মেনে নেবে না, চলমান জীবনের নিকষ পাথরে সবকিছু পরীক্ষা করে তবেই তার মূল্য নির্ধারণ করবে; রাষ্ট্রে সমাজে ধর্মে স্তূপীকৃত প্রাণশক্তি-বিরোধী আবর্জনা থেকে মুক্ত করবে জীবনস্রোতকে। নব জীবনাবেগে হয়তো তারা অনেক ভুল করবে। কিন্তু ভয় তো ভুলকে নয়, ভয় জড়তাকে, বদ্ধ সংস্কারকে। সচল জীবন ভুল করে, আবার ভুলকে অতিক্রমও করে। নবীনের প্রমত্ততা জীর্ণ ঝরা ঝরিয়ে দিয়ে নব কিশলয়ের উদ্গম সম্ভব করে তুলবে। তাদের প্রলয়ঙ্কর পদসঞ্চারে তড়িৎ-ভরা ঝড়ের মেঘের আভাস, কিন্তু পরিণামে তাই আবার মেঘমুক্ত আকাশের দীপ্ত নবীন সূর্যের আবরণ উন্মোচনকারী,—

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।
আয় দুরন্ত, আয়রে আমার কাঁচা!

চিরযুবা তুই যে চিরজীবী,
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।
সবুজ নেশায় ভোর করেছিস ধরা,
ঝড়ের মেঘে তোরি তড়িৎ ভরা,
বসন্তেরে পরাস আকুল-করা
আপন গলার বকুল মাল্যগাছা।
আয়রে অমর, আয় রে আমার কাঁচা। (১ সংখ্যক)

কাব্যের দ্বিতীয় কবিতাটিও প্রায় প্রথমটির অনুরূপ। সমস্ত প্রাচীন, পচা, বদ্ধ আবর্জনার ধ্বংস-সাধন করবার জন্য 'সর্বনেশে'র আগমন সূচিত হয়েছে এই কবিতায়। কবিবন্ধু এনড্রুজ সাহেবের মনে হয়েছে ১৯১৪-র মহাসমরই সেই সর্বনাশের অগ্রদূত এবং কবির কাছে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগেই তার ইঙ্গিত পৌঁছিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কবি বলেছেন, 'আমার এই অনুভূতি ঠিক যুদ্ধের অনুভূতি ছিল না। আমার মনে হয়েছিল যে, আমরা মানবের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে এসেছি, এক অতীত রাত্রি অবসানপ্রায়। মৃত্যু দুঃখ ও বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন।'—

এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।
বেদনায় যে বান ডেকেছে,
রোদনে যায় ভেসে গো।
রক্তমেঘে ঝিলিক মারে,
বজ্র বাজে গহন-পারে,
কোন পাগল ঐ বারে বারে
উঠছে অট্ট হেসে গো!
এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।

এই 'সর্বনেশে' আর কেউ নয়, সে যৌবনেরই অগ্রদূত। আপাত-পাগলামির অট্টপ্রমত্ততার অন্তরালে সে নবজীবন বাণী বহন করে আনছে।

তিন সংখ্যক কবিতাটিতেও পূর্বোক্ত কবিতাদ্বয়ের ভাবানুবৃত্তি। সম্মুখে অগ্রগমনেই জীবনের পরিচয়, পিছনের টানে যারা বদ্ধ তারাই দুঃখময়

স্থবিরত্বের বলি। তাই কণ্টকবিদ্ধ রক্তাক্ত চরণে প্রচণ্ড রৌদ্রদাহের মধ্য দিয়েও সামনে চলতে হবে। যারা এই যাত্রায় নির্ভয়, তারাই অমৃতরস সংগ্রহের অগ্রপথিক।

জাগবে ঈশান, বাজবে বিষাণ,
পুড়বে সকল বন্ধ।
উড়বে হাওয়ায় বিজয়-নিশান,
ঘুচবে দ্বিধাদ্বন্দ্ব।
মৃত্যুসাগর মথন ক'রে
অমৃতরস আনব হ'রে
ওরা জীবন আঁকড়ে ধরে
মরণ-সাধন সাধবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

চতুর্থ কবিতাটিতে যৌবনকে আহ্বান বহুদিনাগত রাষ্ট্রনীতিক অন্যায় ও অবিচার থেকে মুক্ত করে জগৎকে নব ন্যায়দীপ্ত জীবনচেতনার প্রান্তে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য। দীর্ঘদিন ধরে বলবান জাতি দুর্বলের উপর অত্যাচার চালিয়েছে। সমস্ত শান্তির আকাঙ্ক্ষা শক্তি মদমত্তের রক্ত-লোলুপতায় বিপর্যস্ত। তাই আজ সুখের জন্য শুধু নির্বীর্য প্রার্থনা নয়, শান্তির জন্য শুধু পূজার অর্ঘ নিবেদন নয়, আজ তাকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য যৌবনদীপ্ত শক্তির আরাধনা। ন্যায়ের যে জয়শঙ্খ অত্যাচারীর আঘাতে ধূলিলুণ্ঠিত, তাকে দুই হাতে তুলে নিয়ে নবজীবননাদে পূর্ণ করবার জন্য যৌবনের পরশমণিস্পর্শের দীপ্ত প্রার্থনা,—

যৌবনেরই পরশ-মণি
করাও তবে স্পর্শ
দীপক-তানে উঠুক ধ্বনি
দীপ্ত প্রাণের হর্ষ।
নিশার বক্ষ বিদার ক'রে
উদ্‌বোধনে গগন ভ'রে
অন্ধ দিকে দিগন্তরে
জাগাও-না আতঙ্ক।

দুই হাতে আজ তুলব ধরে
তোমার জয়শঙ্খ।

বহুমৃত্যু এবং বিপ্লবের পথ অতিক্রম করে দীর্ঘ রাত্রির দুস্তর তপস্যার মধ্য দিয়ে 'নূতন ঊষার স্বর্ণদ্বার'-প্রান্তে পেঁীছোনোর দীপ্ত আহ্বান বাণী ৩৭ সংখ্যক (ঝড়ের খেয়া) কবিতায়। নবীন-বরণের এমন প্রমত্ত মহোৎসব বাংলা কাব্যে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। 'ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘ', গর্জমান সমুদ্র, 'বহ্নিবন্যাতরঙ্গের বেগ' এবং 'লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোলে'র মধ্য দিয়ে সম্মুখে প্রসারিত নূতন 'জীবন অভিসারের' নির্দেশক এই যাত্রাপথ। বহু মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নূতন জীবন-প্রত্যয়-স্থিত এই জগতে দ্বিধাহীন পদসঞ্চারের জন্য কবির প্রেরণাসঞ্চার,—

মৃত্যু ভেদ করি
দুলিয়া চলেছে তরী।
কোথায় পৌঁছিবে ঘাটে, কবে হবে পার
সময় তো নাই শুধাবার।
এই শুধু জানিয়াছে সার,
তরঙ্গের সাথে লড়ি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী;
টানিয়া রাখিতে হবে পাল,
আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল;
বাঁচি আর মরি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।
এসেছে আদেশ—
বন্দরের কাল হল শেষ।

অজানা সমুদ্রতীর, অজানা সে দেশ—
সেথাকার লাগি
উঠিয়াছে জাগি
ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান।

মরণের গান
উঠেছে ধ্বনিয়া পথে নবজীবনের অভিসারে
ঘোর অন্ধকারে।

৪৪ সংখ্যক (যৌবন) কবিতাটিতেও সুখের নিভৃত নিঃশঙ্ক নিবাস থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের অশান্ত মৃত্যু-আকীর্ণ জগৎ থেকে অমৃত আহরণের জন্য যৌবনকে ডাক দিয়েছেন কবি, বরণ করেছেন নবীনকে তার 'খড়্গসম দীপ্ত শিখায় 'জরার কুজ্ঝটিকা' ছিন্ন করবার জন্য।

যৌবন রে, তুই কি রবি সুখের খাঁচাতে?
তুই যে পারিস কাঁটাগাছের উচ্চ ডালের পরে
পুচ্ছ নাচাতে।
তুই পথহীন সাগর পারের পান্থ,
তোর ডানা যে অশান্ত অক্লান্ত,
অজানা তোর বাসার সন্ধানে রে
অবাধ যে তোর ধাওয়া;
ঝড়ের থেকে বজ্রকে নেয় কেড়ে
তোর যে দাবি-দাওয়া।

এবং এই কাব্যের শেষ কবিতাটিতে (নববর্ষের আশীর্বাদ) পুরাতন যুগকে বিসর্জন দিয়ে নূতন যুগের আহ্বান বাণী ধ্বনিত। এই নূতনের জন্ম কোন স্বর্ণ-ঝিনুক মুখে নিয়ে নয়, 'রুদ্রের ভৈরব গান', 'ধূসর পথের ধুলা,' 'কাল বৈশাখীর আশীর্বাদ', 'শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ', 'কণ্টকের অভ্যর্থনা' এবং পথে পথে 'গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা'র মধ্য দিয়ে এই নূতনের আগমন সূচিত। বহু বাধা মৃত্যু ও যন্ত্রণা-দীর্ণ, তবুও দীপ্ত জীবনপ্রত্যয়-স্বাক্ষরিত নব বর্ষের উদ্বোধনে এই কাব্যগ্রন্থের সমাপ্তি,—

পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল ওরে যাত্রী!
এসেছে নিষ্ঠুর,
হোক রে দ্বারের বন্ধ দূর,
হোক রে মদের পাত্র চুর।

নাই বুঝি, নাই চিনি, নাই তারে জানি,
ধরো তার পানি—
ধ্বনিয়া উঠুক তব হৃৎকম্পনে তার দীপ্ত বাণী।
ওরে যাত্রী,
গেছে কেটে, যাক কেটে পুরাতন রাত্রি।

এই কাব্যগ্রন্থে আর একশ্রেণীর যৌবনের কবিতা আছে। এগুলি কবির ব্যক্তিগত যৌবনস্মৃতির। বলা হয় বলাকায় কবির দ্বিতীয় যৌবন। বলাকা রচনার ঠিক আগে কবি দীর্ঘদিন পাশ্চাত্ত্য পৃথিবীতে অতিবাহিত করেছিলেন, এ-কথা আগেই বলেছি। সেখানকার যৌবনমত্ত জীবনচেতনা সম্ভবত কবি-মানসেও নবতর যৌবনানুভূতির প্রেরণাও সঞ্চার করেছিল। তারই ফলে পৌঢ়ত্বপ্রান্তে কবির দ্বিতীয়বার যৌবন-উপলব্ধি। এই যৌবন শরীরগত সীমায়তি ছাড়িয়ে প্রতীকে পরিণত। তার ফলে সময়ের সীমা পার হয়ে কবিমানসে চিরন্তনত্ব লাভ করেছে এই যৌবন। কবির পার্থিব বয়ঃভারাক্রান্ত বহির্জীর্ণ শরীরের অন্তরালে প্রতীকায়িত এই যৌবন অহরহ তার নবীনস্পর্শ সঞ্চারিত করে চলেছে, বিচিত্র জীবন-পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে, এমন কি জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়েও। কবি নতুন করে উপলব্ধি করছেন তাঁর 'বহু দিনকার ভুলে-যাওয়া যৌবন' সহসা তাঁর কাছে পত্রদূত প্রেরণ করেছে এবং

লিখেছে সে—
এসো এসো, চলে এসো বয়সের জীর্ণ পথ শেষে,
মরণের সিংহদ্বার
হয়ে এসো পার ;
ফেলে এসো ক্লান্ত পুষ্পহার।
ঝ'রে পড়ে ফোটা ফুল, খ'সে পড়ে জীর্ণ পত্রভার,
স্বপ্ন যায় টুটে,
ছিন্ন আশা ধূলিতলে পড়ে লুটে।
শুধু আমি যৌবন তোমার
চিরদিনকার ;
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারম্বার
জীবনের এপার ওপার। (১৩/যৌবনের পত্র)

কবির ব্যক্তিগত যৌবন-চেতনার আরও পরিচয় রয়েছে আলোচ্য কাব্যের ১৮ (যাত্রা), ২১ (অগ্রণী), ২৫ (এবার), ২৬ (আবার) এবং ৪০ (চেয়ে দেখা) সংখ্যক কবিতায়। ১৮ সংখ্যক কবিতাটিতে ব্যক্তিগত বার্ধক্য অতিক্রম করে বিশ্বাত্মক যৌবন-চেতনার মধ্যে কবি-মানসের পদসঞ্চার। যে-বার্ধক্য তার স্তূপাকার আয়োজনের দ্বারা কবিকে স্থবিরত্বের দিকে আকর্ষণ করছে, তার আহ্বানকে অস্বীকার করে চিরন্তন যৌবন-চেতনাকে অর্ঘ নিবেদন,—

কেন মিছে
আমার ডাকিস পিছে?
আমি তো মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে
রব না ঘরের কোণে থেমে।
আমি চিরযৌবনেরে পরাইব মালা,
হাতে মোর তারি তো বরণডালা।
ফেলে দিব আর সব ভার,
বার্ধক্যের স্তূপাকার
আয়োজন।

কবির এই ব্যক্তিগত যৌবন-চেতনা কারুণ্য-মিশ্রিত। কবিকে এ-যৌবন নবীন শক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ করে না, কেবল কবিকে পুরাতন যৌবনস্মৃতিচারণে প্রবুদ্ধ করে মাত্র। এই স্মৃতিচারণ বেদনামণ্ডিত, কারণ, বাস্তবে আর কোনদিন তা রূপমূর্তি পরিগ্রহ করবে না। এই ভাবনার অভিব্যক্তি ২৫ সংখ্যক (এবার) কবিতায়—

যে বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল
লয়ে দলবল
আমার প্রাঙ্গণতলে কলহাস্য তুলে
দাড়িম্বে পলাশগুচ্ছে কাঞ্চনে পারুলে,
নবীন পল্লবে বনে বনে
বিহ্বল করিয়াছিল নীলাম্বর রক্তিম চুম্বনে,
সে আজি নিঃশব্দে আসে আমার নির্জনে;

অনিমেষে
নিস্তব্ধ বসিয়া থাকে নিভৃত ঘরের প্রান্তদেশে
চাহি সেই দিগন্তের পানে
শ্যামশ্রী মূর্ছিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে।

এবারের এই যৌবন শুধু ক্ষীণ মর্মরকল্লোলে, গানের মৃদু গুঞ্জনে রক্তবরণ হৃদয়ের ব্যথার মতো কবি মানসে সঞ্চারিত হয়ে শেষ হয়ে গেল। দূর ভবিষ্যতে রূপমুগ্ধ প্রেমের মত আবার তা জাগ্রত হয়ে উঠবে, সেই কামনায় এ-জনমের শেষ প্রহর-যাপন,—

এবারে ফাল্গুনের দিনে সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায়
এই-যে আমার জীবন-লতিকায়
ফুটল কেবল শিউরে-ওঠা নতুন পাতা যত
রক্তবরণ হৃদয়-ব্যথার মতো ;
দখিন হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে দিল কেবল দোল,
উঠল কেবল মর্মরকল্লোল।
এবার শুধু গানের মৃদু গুঞ্জনে
বেলা আমার ফুরিয়ে গেল কুঞ্জবনের প্রাঙ্গণে।
আবার যেদিন আসবে আমার রূপের আগুন ফাগুন-দিনের কাল
দখিন-হাওয়ায় উড়িয়ে রঙীন পাল,
সেবারে এই সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায়
যেন আমায় জীবন-লতিকায়
ফোটে প্রেমের সোনার বরণ ফুল ;
হয় যেন আকুল
নবীন রবির আলোকটি তাই বনের প্রাঙ্গণে ;
আনন্দ মোর জনম নিয়ে
তালি দিয়ে তালি দিয়ে
নাচে যেন গানের গুঞ্জনে। (২৬/আবার)

ভবিষ্যতের এই আশা আর অতীতের স্মৃতি-চারণে কবির এবারের যৌবন-উপলব্ধির পরিসমাপ্তি। বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত কবি এই কাব্যশেষে

ভবিষ্যতের উক্ত আশার সঙ্গে যৌবনস্মৃতির দিকে শেষবারের মত তাঁর মানস-দৃষ্টি পাঠিয়ে দিলেন, বার্ধক্যের বাঁশীতে শেষবারের মত করলেন যৌবনের সুরঝঙ্কার, আজকের দেখা পৃথিবী মানুষ প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করলেন কতদূর অতীতের যৌবনস্পৃষ্ট জীবনালেখ্য,—

তাই যা দেখিছ তারে ঘিরেছে নিবিড়
যাহা দেখিছ না তারি ভিড় ;
তাই আজি দক্ষিণপবনে
ফাল্গুনের ফুলগন্ধে ভরিয়া উঠিছে বনে বনে
ব্যাপ্ত ব্যাকুলতা,
বহু শত জনমের চোখে-চোখে কানে-কানে কথা (৪০/চেয়ে দেখা)

[ছয়]

কাব্যের নামকরণঃ বলাকার ব্যঞ্জনা।

'বলাকা' শব্দের অর্থ উড্ডীয়মান বকের শ্রেণী। বকের দল যখন শ্রেণীবদ্ধ হয়ে উড়ে যায়, তখন আকাশের প্রেক্ষাপটে তাদের চলমানতা অপূর্ব সৌন্দর্যে বিধৃত হয়ে আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়। এই সৌন্দর্যময় গতিশীলতার বাণীই আলোচ্য কাব্যের বাণী। তাই কবি কাব্যের নামকরণ করেছেন 'বলাকা'।

শব্দটি অপূর্ব ব্যঞ্জনাবহ। বলাকা শব্দটিতে বক বা পাখীর চিত্র আভাসিত বটে, কিন্তু সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত হয়ে। আকাশে উড্ডীয়মান বকপংক্তির প্রত্যেকটি পাখী বিচ্ছিন্ন এক বটে, আবার তাদের প্রত্যেকটি সমগ্র শ্রেণীর এককও (unit) বটে। আর সেই শ্রেণীবদ্ধতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সামনের দিকে সেই পক্ষীসমূহের দীর্ঘগতির ইঙ্গিত। কোন 'বেগের আবেগে' তারা উড়ে চলেছে অনির্দেশ্য সামনের দিকে।

উড্ডীয়মান বলাকার মধ্য দিয়ে আরও একটি ইঙ্গিত আভাসিত। আমাদের বাস্তব দৃষ্টিতে বা কাল্পনিক চিত্রকল্পে আমরা বলাকাকে তার প্রেক্ষাপট,—আকাশ-প্রাঙ্গণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারি না। বলাকার গতি আমাদের সীমিত দৃষ্টিতে অন্তহীন, অনির্দেশ্য বলে মনে হয়, কিন্তু তা আকাশের চন্দ্রাতপতলেই বিস্তারিত। আকাশ-ছাড়িয়ে সে গতির পক্ষে অন্ত

কোথাও পক্ষসঞ্চারী হওয়া সম্ভব নয়, কারণ আকাশ (continuum) সর্বব্যাপ্ত, সর্বত্র। উড্ডীয়মান বকশ্রেণীর চিত্রকে এই আকাশপট থেকে বিবিক্ত করে উপভোগ করা অসম্ভব। তাই বলাকার ব্যঞ্জনায় এই আকাশও সম্পৃক্ত।

আর সব মিলিয়ে এই অর্থগত ব্যঞ্জনা ছাড়াও রয়েছে একটি আশ্চর্য রসব্যঞ্জনা—অতুলনীয় সৌন্দর্যপ্রকাশক্ষম চিত্রকল্প। সন্ধ্যার ম্লানস্পর্শ আলো, শ্বেতপক্ষ উড্ডীন বিহঙ্গদল, শূন্যের প্রান্তরে তাদের ডানার শব্দের বিদ্যুৎ-লেখা—সব মিলিয়ে অনির্বচনীয় রস-অভিব্যক্তি।

বলাকা নামের মধ্য দিয়ে এই ত্রয়ী ইঙ্গিত—গতি, আকাশ-পটপ্রেক্ষায় তার বিস্তার এবং সৌন্দর্যময়তা—আভাসিত। এই কাব্যগ্রন্থের সমস্ত কবিতাগুলির সামগ্রিক ব্যঞ্জনাও তাই। তাই নামকরণটি তাৎপর্যময়, যথাযথ এবং সার্থক।

আলোচ্য কাব্যের প্রত্যেকটি কবিতা বিচ্ছিন্নভাবে এক-একটি বিশিষ্ট বক্তব্যকে ধারণ করে আছে, পৃথক এক-একটি বিহগের মতই তারা বৈশিষ্ট্যে এবং সৌন্দর্যে ভিন্ন। কোন কবিতার মূল বক্তব্য নবীন-বরণ (১ সংখ্যক), কোনটিতে বা মহাযুদ্ধের প্রলয়ঙ্কর পূর্বাভাস (২ সংখ্যক), কোনটি বা ধারণ করে আছে ব্যক্তির বাইরে অভিব্যক্ত জীবন-ক্রিয়ার কেন্দ্রীয় প্রেম-প্রেরণা রূপ তত্ত্বটিকে (৬ সংখ্যক), কোথাও বা তা সর্বমুক্ত ব্যক্তিসত্তার জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে মহাপ্রয়াণের ইঙ্গিতবহ (৭ সংখ্যক), কোথাও বা বিশ্বজাগতিক গতির বন্দনা (৮ সংখ্যক), কোথাও বা রাষ্ট্রীয় পঙ্ক-মুক্তির জন্য বিপ্লবের আহ্বান বাণী (৩৭ সংখ্যক), কোন কবিতায় বা মানুষের প্রতিনিধিরূপে কবির ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের অর্ঘ প্রদান, কোথাও বা ফেলে-আসা যৌবনের স্মৃতিচারণ প্রভৃতি প্রভৃতি। কিন্তু বিচিত্র ও বিচ্ছিন্ন হয়েও তারা আবার এমন একটি সামগ্রিক বক্তব্যকে ধারণ করে আছে, যার সঙ্গে তুলনা চলে বলাকা পংক্তির উড়ে-চলার ব্যঞ্জনার। বলাকা পংক্তির উড়ে চলার মধ্য দিয়ে গতির বাণী অভিব্যক্ত; এই কাব্যের কবিতাগুলিরও কেন্দ্রীয় বাণী তাই—গতি। তাই কবিতাগুলি বিচ্ছিন্নভাবে যেন এক-একটি বিহঙ্গম এবং সামগ্রিকভাবে গতিচেতনার বাণী-ব্যক্তকারী চলমান বলাকা। এই তাৎপর্যবহ কাব্যনামটি তাই সার্থকতায় তুলনাহীন।

এই কাব্যের ৩৬ সংখ্যক কবিতাটির মধ্যদিয়ে এই সমষ্টিগত নামকরণের তথা সমগ্র কাব্যের মর্মভাবটি ব্যক্ত। কবিতাটির নামও বলাকা। একদা

ঝিলমের ধারে, সন্ধ্যায়, অন্ধকার গিরতটতলে স্তব্ধ দেওদারসারির উপর উড্ডীয়মান বলাকা চকিতে শূন্যের প্রান্তরে শব্দের বিদ্যুৎ ছটায় কবির মনে 'বেগের আবেগ' সৃষ্টি করে চলে গিয়েছিল। 'ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত' তাদের পাখা স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করে সৃষ্টির অভ্যন্তরস্থ 'অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ'কে ব্যক্ত করে তুলেছিল। কবি অনুভব করেছিলেন সব আপাত-স্তব্ধতার অন্তরালে এক অস্থির বেগ-প্রেরণা। আভ্যন্তরীণ (Potential) গতির প্রেরণাতে আমাদের বিশ্বজগৎ, জৈবজগৎ, মনুষ্যজগৎ, মনুষ্যসভ্যতা ব্যক্তি-মানুষ সবকিছুই কেবলই বিবর্তিত পরিবর্তিত হতে হতে চলেছে। এই গতি কেবল অন্তহীন নয়, পরিণামহীনও বটে। বলাকার পাখার শব্দের বিদ্যুৎছটার মধ্য দিয়ে কবি অনুভব করেছিলেন,—

ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে!'

আলোচ্য কবিতাটি কেমনভাবে সমগ্র কাব্যটির মর্মভাবটি ধারণ করে আছে, কবিতাটির আলোচনা-প্রসঙ্গে সে সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, 'সেদিন যে একদল বুনো হাঁসের পাখা সঞ্চালিত হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারের স্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়েছিল, কেবল এই ব্যাপারই আমার কাছে একমাত্র উপলব্ধির বিষয় ছিল না। কিন্তু বলাকার পাখা যে নিখিলের বাণীকে জাগিয়ে দিয়েছিল, সেইটাই এর আসল বলবার কথা এবং বলাকা বইটার কবিতাগুলির মধ্যে এই বাণীটিই নানা আকারে ব্যক্ত হয়েছে। বলাকা নামের মধ্যে এই ভাবটা আছে যে, বুনো হাঁসের দল নীড় বেঁধেছে, ডিম পেড়েছে, তাদের ছানা হয়েছে, সংসার পাতা হয়েছে—এমন সময় তারা কিসের আবেগে অভিভূত হয়ে পরিচিত বাসা ছেড়ে পথহীন সমুদ্রের উপর দিয়ে কোন্ সিন্ধুতীরে আর-এক বাসার দিকে উড়ে চলেছে।

'সেদিন সন্ধ্যায় আকাশপথে যাত্রী হংসবলাকা আমার মনে এই ভাব জাগিয়ে দিল—এই নদী, বন, পৃথিবী, বসুন্ধরার মানুষ, সকলে এক জায়গায় চলেছে; তাদের কোথা থেকে শুরু, কোথায় শেষ, তা জানি নে। আকাশে তারার প্রবাহের মতো, সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহের ছুটে চলার মতো, এই বিশ্ব কোন্ নক্ষত্রকে কেন্দ্র ক'রে প্রতি মুহূর্তে কত মাইল বেগে ছুটে চলেছে। কেন তাদের এই ছুটাছুটি তা জানি নে, কিন্তু ধাবমান নক্ষত্রের মতো তাদের একমাত্র এই বাণী—এখানে নয় এখানে নয়।'

উক্ত সঞ্চালিত-পাখা বুনো হাঁসের গতির বাণীই এই কাব্যের কবিতাগুলিরও সমষ্টিগত বাণী। তাই কাব্যের আলোচ্য নামকরণ। এই কাব্যের যে কবিতাগুলির মুখ্য উপজীব্য গতিচেতনা তারা হচ্ছে, ৮ সংখ্যক (চঞ্চলা), ৭ সংখ্যক (শাজাহান), ৩৬ সংখ্যক (বলাকা) এবং ৩৭ সংখ্যক (ঝড়ের খেয়া)। চঞ্চলায় বিশ্বজাগতিক গতির কথা, শাজাহানে ব্যক্তিসত্তার গতিময়তা। বলাকায় সর্বাত্মক গতি এবং ঝড়ের খেয়ায় সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিপ্লবচেতনা। এদের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা গতিতত্ত্ব প্রসঙ্গে করেছি। এ-গুলি ছাড়াও রয়েছে নবীনবরণ ও যৌবন-চেতনার কবিতা—১, ২, ৩, ৪, ৪৪ ও ৪৫ সংখ্যক কবিতা। এ-কবিতাগুলিও প্রকারান্তরে গতি-তত্ত্বের পরিচয়বাহী। যৌবনের জয়গান প্রসঙ্গে সে আলোচনাও করা হয়েছে। পরোক্ষ গতিচেতনার পরিচয় রয়েছে মানব শ্রেষ্ঠত্ববিষয়ক কবিতাগুলিতে—১৭ সংখ্যক (প্রেমের পরশ), ২৮ সংখ্যক (দেনা-পাওনা) এবং ২৯ সংখ্যক (তুমি আমি) কবিতা। কবির কাছে মানবশ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম প্রধান কারণ, সে বিবর্তনের ফলশ্রুতি,—বিশ্ববিবর্তন ও জৈববিবর্তনের আধুনিকতম পরিণতি, latest edition। এ-বিষয়ের আলোচনা রয়েছে 'বলাকার মানব চেতনা'য়। অতএব এখানেও সেই গতিরই কথা। দু-একটি কবিতা বাদ দিলে এই কাব্যের সকল কবিতার মর্মবাণী—'গতি'। 'বলাকা'র মধ্য দিয়ে সেই ব্যঞ্জনারই অভিব্যক্তি।

এই কাব্যে কবি প্রথমে অকারণ অবারণ গন্তব্যহীন গতি চেতনার খুব কাছাকাছি এসেছিলেন, গতি-তত্ত্ব প্রসঙ্গে সে আলোচনাও আমরা করেছি। পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক (ডারউইন ও বার্গস°-র) গতি চেতনার সমধর্মী এই গতি-চেতনা। চঞ্চলায় কবি বলেছিলেন, 'চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিনী' এবং বলাকা-কবিতায় 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে'। এই বাক্যদ্বয় অনির্দেশ্য গতির দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। আগেই কবির উক্তি উদ্ধৃত করে আমরা দেখিয়েছি, ঝিলমের ধারে যে বুনোহাঁসের দল কবিকে 'গতির আবেগে' উদ্বুদ্ধ করেছিল, তাদের গমন পথের কোথায় বা সমাপ্তি, কোথায় বা তাদের গন্তব্য, তা কবির কাছে ধরা পড়েনি। এই হাঁসের দল কবির মনে এই ভাব জাগিয়ে ছিল, সব কিছুর কোথা থেকে সুরু এবং কোথায় শেষ তার ঠিক নেই। অর্থাৎ গতি অনির্দেশ্য,

গন্তব্যহীন। এই তত্ত্বেরই পরিচয় বহন করে আছে উড্ডীয়মান বুনো হাসের দল এবং তাদেরই নামধৃত আলোচ্য কাব্যগ্রন্থ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবি এই উদ্দেশ্যহীন গন্তব্যহীন গতির বাণীকে অতিক্রম করেছেন। কবি উপনিষদের ঋষির মত উপলব্ধি করেছেন সকল গতিই একটি স্থির শান্ত কল্যাণময় সত্যের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে ব্যাপ্ত। সত্যের এই প্রসারিত প্রাঙ্গণেই সকল গতির চলতা, সকল অভিব্যক্তির চঞ্চলতা। ঝড়ের খেয়া কবিতায় কবির পরিণততর উপলব্ধি—'শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক'।

আমরা 'বলাকা'র ব্যঞ্জনা-প্রসঙ্গে বলেছি, উড্ডীয়মান বলাকাকে আকাশের প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবা যায় না। বলাকার সকল চলমানতা আকাশের বিস্তারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ঠিক তেমনি এই বিশ্বস্থ সকল গতি, সকল অভিব্যক্তি একটি কল্যাণময় সত্যের প্রেক্ষাপটে বিধৃত। সত্যের, 'একম্এবঅদ্বিতীয়মে'র, শিবচেতনার বিস্তৃত আকাশপটে বিশ্বজাগতিক সকল গতি নিজেকে বিচিত্রভাবে ও বিচিত্ররূপে অভিব্যক্ত করছে। ঈশোপনিষদের কবির যে উপলব্ধি—গতিশীল এই জগতের গতিময় সকল কিছু ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত, 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ', রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি শেষ পর্যন্ত তারই সমধর্মী। বলাকার আকাশ-প্রেক্ষাপটের ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে সেই ব্যঞ্জনাও ব্যক্ত। বলাকার আকাশ সেই 'সত্য' সেই 'শিব' সেই চিরন্তন 'একের' প্রতীক। তাই সব মিলিয়ে বলাকার ব্যঞ্জনা গতি ও গতির স্থির প্রেক্ষাপটকে প্রকাশ করেছে। একই বৈশিষ্ট্যধৃত কবিতাগুলি তাই যে কাব্যগ্রন্থে গ্রথিত, তারও ঐ একই নামকরণ অপূর্ব তাৎপর্যবহ, যথাযথ ও সার্থক।

কিন্তু উড়ে-চলা বুনোহাঁসের দল শুধু গতির তত্ত্বকেই ব্যক্ত করে না, অপূর্ব সৌন্দর্যকেও প্রকাশ করে। ঠিক তেমনি এই কাব্যের গতির বক্তব্য-ধৃত রচনাগুলি গতি-দর্শনকে অতিক্রম করে সৌন্দর্যধৃত কবিতা হয়ে উঠেছে। তত্ত্ব এখানে কাব্যিক সৌন্দর্যরূপে, আনন্দময় উপলব্ধিরূপে অভিব্যক্ত। এই কাব্যের কবিতাগুলি যে কি অপূর্ব কাব্য-সৌন্দর্যবিধৃত, তা কাব্যসৌন্দর্য প্রসঙ্গে আলোচনা করে দেখিয়েছি। এই কাব্যের বিশিষ্ট ভাবটি যে কবিতাটিতে সব থেকে সংহত হয়ে প্রকাশিত, সেই 'বলাকা' নামের কবিতাটির প্রেরণা পক্ষীদলের যে পক্ষ সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছিল, সেই পক্ষসঞ্চালন

পক্ষীদলের উড়ে চলার অপূর্ব সৌন্দর্যও কবির মনে মুদ্রিত করে দিয়েছিল। তাদের পাখা-আন্দোলনে গতি-চেতনা শুধু তত্ত্বরূপেই উদ্ভাসিত হয়নি, পক্ষান্তরে 'ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত' সেই পক্ষসঞ্চালন রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে বিস্ময়ের জাগরণ' আকাশে তরঙ্গিত করে চলেছিল। তত্ত্বাতিরিক্ত এই আনন্দময়তা, সৌন্দর্যবিকাশ এবং বিস্ময়ের জাগরণ এই কাব্যধৃত কবিতাগুলিরও অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কেবলমাত্র গতিতত্ত্বের আলোচনা ও ব্যাখ্যাই যদি কবির উদ্দেশ্য হতো, তা-হলে তিনি দর্শনের গ্রন্থ রচনা করতেন, কাব্যগ্রন্থ কদাপি নয়। কিন্তু তিনি গতির সৌন্দর্যময়তাকে এবং সৌন্দর্যের গতিময়তাকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। জীবনে জগতে সমাজে রাষ্ট্রে গতির রস-উপলব্ধিকে ধারণ করে আছে এই কাব্যের কবিতাগুলি। 'বলাকা' নামকরণটিতে তত্ত্বগত ব্যঞ্জনার সঙ্গে সেই সৌন্দর্যও অভিব্যঞ্জিত। সেদিকে দিয়েও নামটি তুলনাহীন ইঙ্গিতগর্ভ।

অতএব বকপংক্তির বা বুনোহাঁসের আকাশ-প্রাঙ্গণে ওড়ার মধ্য দিয়ে যে গতি, গতির স্থির ধারণ-পটপ্রেক্ষা এবং সৌন্দর্য অভিব্যক্ত, এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্য দিয়েও সেই ত্রয়ী বক্তব্য ব্যক্ত। আবার সেই ত্রয়ীবক্তব্যের ইঙ্গিত আভাসিত কাব্যের 'বলাকা' নামে। তাই নামটি তাৎপর্যময়, সৌন্দর্য-ব্যঞ্জনাক্ষম, যথার্থ এবং সার্থক।

[সাত]

রবীন্দ্র-কাব্যধারা ও বলাকা

বলাকা কাব্যের বক্তব্য এবং আঙ্গিকে অভিনবত্ব আছে। কারো মতে এই বৈশিষ্ট্য তাঁর কাব্য-চেতনায় নবাগত। কিন্তু সকলেই এই মত সমর্থন করেন না। অন্য কারো কারো মতে রবীন্দ্রনাথের বিবর্তনশীল কাব্যজীবনে যেমন প্রত্যেক স্তরই পূর্ববর্তী স্তরের পরিণতি, তেমনি এটিও। হঠাৎ উদ্ভূত কোন ব্যাপার নয়, পূর্বতন পর্যায়েরই এটি ক্রমবিকশিত রূপ। আবার অন্য কেউ কেউ মনে করেছেন, এটি যদি তাঁর পূর্বতন ধারার পরিণতি নাও হয়, তথাপি এই কাব্যের ভাববীজ পূর্বের কাব্যধারার মধ্যেই বর্তমান ছিল।

রবীন্দ্রনাথের জীবন-বিবর্তনের সাথে সাথে তাঁর কাব্যধারার বিবর্তন চলেছে—রূপ থেকে রূপান্তরে গূঢ় ভাববীজের ক্রমঅভিব্যক্তির মধ্যে দিয়ে। অবশ্য তারই সঙ্গে নব নব ভাব, চিন্তা, চেতনা, জীবন-উপলব্ধিকেও কবি আত্মসাৎ এবং ক্রম-প্রকাশ করতে করতে এগিয়ে চলেছেন তাঁর কাব্য-জীবন পথে। তাই রূপ থেকে রূপান্তরে যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে ভাব থেকে ভাবান্তরেও কবি গিয়েছেন, কিংবা বিপরীতক্রমে। অবশ্য কয়েকটি স্থায়ীভাব ও ধ্রুব-চেতনা সকল অস্থায়ীভাব ও চলমান কাব্যজীবনপ্রবাহের মধ্যে অচঞ্চল হয়ে মিশে ছিল। কবির সেই ধ্রুব জীবনপ্রত্যয়ের ক্রমবিকাশ হয়েছে, কিন্তু পরিবর্তন হয়নি।

ভাব এবং আঙ্গিকের ক্রমবিকাশ এবং অভিনবত্ব অনুসারে রবীন্দ্র-কাব্যজীবনের বিভিন্ন পর্যায়কে আমরা বিভিন্ন নামকরণ দ্বারা চিহ্নিত করেছি। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে প্রত্যেক স্তরের বৈশিষ্ট্য পূর্বতন স্তরের মধ্যেই আত্মগোপন করেছিল এবং পূর্বতন ভাব বৈশিষ্ট্যের অধিকতর পরিণতরূপ পরবর্তী স্তর। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যেক স্তরই তার আঙ্গিক এবং ভাববক্তব্য নিয়ে আবার স্বয়ং-সম্পূর্ণও বটে। ফুলের মধ্যেই যেমন ফলের আগমনী আভাসিত, অথচ বাইরের দৃষ্টিতে ফুল নিজেই স্বয়ং-সম্পূর্ণ, তেমনি রবীন্দ্র-কাব্যজীবনের প্রত্যেক স্তর সম্পূর্ণ হয়েও পরবর্তী স্তরের বৈশিষ্ট্য-গর্ভ। কোন বিশেষ পর্যায়ের অন্তরে পরবর্তী পর্যায়ের লক্ষণগুলি প্রায় সকল সময়ই সংগুপ্ত।

বলাকা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনপ্রবাহকে আমরা নিম্নলিখিত পর্যায়ক্রমে ভাগ করতে পারি—

(১) বাল্য পর্যায়: কবির প্রথম কবিতা-রচনাকাল থেকে ১৮৮২ খৃঃ পর্যন্ত। এই পর্যায়ের শেষ কাব্য বাল্মীকি প্রতিভা।

(২) প্রস্তুতি পর্যায়: সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, ছবি ও গান এবং কড়ি ও কোমল এই পর্যায়ের কাব্য। ১৮৮২ থেকে ১৮৮৬ পর্যন্ত বিস্তৃত।

(৩) প্রাপ্তি পর্যায়: মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, কল্পনা, কথা, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য, স্মরণ, শিশু, উৎসর্গ এই পর্যায়ের কাব্য। ১৯০৪ পর্যন্ত পর্যায়টি বিস্তারিত।

(৪) সংশয় পর্যায়: খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি এই পর্যায়ের। ১৯১৩ পর্যন্ত বিস্তারিত।

(৫) গতি পর্যায়: বলাকা, পলাতকা, শিশু ভোলানাথ, পূরবী, মহুয়া, বনবাণী, পরিশেষ এই পর্যায়ের। ১৯৩২ পর্যন্ত বিস্তৃত।

বলাকা কাব্যের ভাববৈশিষ্ট্যর আভাস, কখনও বা তার ব্যক্তরূপ, পূর্ববর্তী পর্যায়গুলিতে যে কখনও অঙ্গধারণ করে, কখনও বা অনঙ্গ হয়ে বর্তমান ছিল, তা ঐসকল পর্যায়ের কিছু কিছু কবিতা আলোচনা করলে পরিষ্কার হবে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা বুঝতে পেরেছি, বলাকার ভাবগত উপজীব্য গতিচেতনা, মানবচেতনা, নবীনবরণ এবং যৌবনের জয়গান। এই চেতনাগুলির বৈশিষ্ট্য ও পটভূমিকাও আমরা অনুধাবন করেছি। প্রাক-বলাকা বিভিন্ন পর্যায়ের কাব্যের মধ্যে তাদের পূর্বপরিচয় কতদূর পাওয়া যায় এখন আমরা তা পরীক্ষা করে দেখবো।

বলাকা কাব্যের মূল ভাব গতিচেতনা। অন্য সকল ভাবগুলি ঐ মূল ভাবেরই রূপান্তর। এই কাব্যে কবি অনুভব করেছেন চলতাই এই বিশ্বের এবং বিশ্বস্থ সকল কিছুর ধর্ম। এই চলতার ফলে বিশ্বজগৎ, জৈবজগৎ, মনুষ্যসভ্যতা সকল কিছুই বিবর্তনশীল। চলতার অভাবই মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে, সমস্ত কিছুকে আবর্জনায় ভরে তোলে। সামগ্রিক মুক্তির জন্য এই গতিময়তার প্রয়োজন। কবির প্রস্তুতি পর্যায়ের 'প্রভাত সঙ্গীত' কাব্যান্তর্গত 'নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গে'র মধ্যেই এর প্রথম পরিচয় পাচ্ছি বলাকা কাব্যের প্রায় ৩২ বৎসর আগে। কবির বয়স যখন মাত্র ২০/২১ বৎসরে। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় কবির আকূতি—

কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারিদিকে তার বাঁধন কেন।
ভাঙ্‌রে হৃদয়, ভাঙ্‌রে বাঁধন,
সাধরে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর 'পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের পর আঘাত কর্।

প্রাপ্তি পর্যায়ের 'সোনার তরীতে' জগৎ-প্রবাহের চির গতিময়তার আরও ব্যক্তরূপ এবং 'সাজাহান' কবিতায় সকল পার্থিব সম্পদের ও ব্যক্তিসত্তার যে বিষাদচিহ্নিত অচিরস্থায়িত্ব তারই প্রাক্ পরিচয় ধারণ করে আছে উক্ত কাব্যের কবিতা—

এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত ছেয়ে
সব-চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন, 'যেতে নাহি দিব।' হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।
চলিতেছে এমনি অনাদিকাল হতে।
প্রলয় সমুদ্রবাহী সৃজনের স্রোতে
প্রসারিত-ব্যগ্রবাহু জলন্ত-আঁখিতে
'দিব না দিব না যেতে' ডাকিতে ডাকিতে
হু হু করে তীব্র বেগে চলে যায় সবে
পূর্ণ করি বিশ্বতট আর্ত কলরবে।
সম্মুখ-ঊর্মিরে ডাকে পশ্চাতের ঢেউ,
'দিব না দিব না যেতে।' নাহি শুনে কেউ
নাহি কোন সাড়া॥ (যেতে নাহি দিব)

কিংবা,

কে আছে কোথায়, কে আসে কে যায়—
নিমেষে প্রকাশে, নিমেষে মিলায়,
বালুকার 'পরে কালের বেলায়
ছায়া-আলোকের খেলা।
জগতের যত রাজা মহারাজ
কাল ছিল যারা কোথা তারা আজ,
সকালে ফুটিছে সুখদুখলাজ
টুটিছে সন্ধ্যাবেলা। (পুরস্কার

এই কবিতাংশদ্বয় কি সাজাহানের নিম্নলিখিত পংক্তিগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয় না?—

হায় ওরে মানবহৃদয়,
বার বার
কারো পানে ফিরে চাহিবার
নাই যে সময়,
নাই নাই।

জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই
ভুবনের ঘাটে ঘাটে—
এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য হাটে।
দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবীমঞ্জরী
যেই ক্ষণে দেয় ভরি
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল,
বিদায়গোধূলি আসে ধুলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল।

বলাকায় কবি উদ্দেশ্যহীন গতির খুব কাছাকাছি এসেছেন, এ আমরা দেখেছি। 'চঞ্চলা' কবিতায় কবির উক্তি, 'চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিনী', বা ৩৬ সংখ্যক কবিতায়, 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে'। এই ভাবেরই অস্ফুট দূরাগত পদচিহ্নের আভাস 'সোনার তরী'র 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য়—

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী।
বল কোন্ পারে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।
যখনই শুধাই ওগো বিদেশিনী,
তুমি হাস শুধু মধুরহাসিনী,
বুঝিতে না পারি কী জানি কী আছে তোমার মনে।
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি,
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন গগন কোণে।
কী আছে হোথায় চলেছি কিসের অন্বেষণে॥

কবির এই গতিচেতনা রাষ্ট্রীয় পটপ্রেক্ষায় বিপ্লবের রূপ ধারণ করেছিল। তার সবিশেষ পরিচয় রয়েছে বলাকার 'ঝড়ের খেয়া'য়। সকল সুখ-আরাম বিসর্জন দিয়ে সবকিছু নিয়ে সেই বিপ্লবের গর্ভে আত্ম-বিসর্জনের জন্য কবি ডাক দিয়েছেন,—ঐ কবিতা প্রসঙ্গে আমরা তা উপলব্ধি করেছি। সেই উদাত্ত আহ্বানের পূর্ব পরিচয় উৎকীর্ণ 'খেয়া' কাব্যরচনার পূর্ববর্তী একটি কবিতা 'দুঃপ্রভাতে'—

রুদ্র, তোমার দারুণ দীপ্তি
এসেছে দুয়ার ভেদিয়া ;
বক্ষে বেজেছে বিদ্যুৎবাণ
স্বপ্নের জাল ছেদিয়া।
ভাবিতেছিলাম উঠি কি না উঠি,
অন্ধ তামস গেছে কি না ছুটি,
রুদ্ধ নয়ন মেলি কি না মেলি
তন্দ্রাজড়িমা মাজিয়া।
এমন সময়ে ঈশান, তোমার
বিষাণ উঠেছে বাজিয়া।

*

তোমার শ্মশানকিঙ্কর দল
দীর্ঘ নিশায় ভুখারি
শুষ্ক অধর লেহিয়া লেহিয়া
উঠিছে ফুকারি ফুকারি।
অতিথি তারা যে আমাদের ঘরে
করিছে নৃত্য প্রাঙ্গণ-'পরে,
খোলো খোলো দ্বার ওগো গৃহস্থ,
থেকো না থেকো না লুকায়ে—
যার যাহা আছে আনো বহি আনো
সব দিতে হবে চুকায়ে।
ঘুমায়ো না আর কেহ রে।
হৃদয়পিণ্ড ছিন্ন করিয়া
ভাণ্ড ভরিয়া দেহ রে।
ওরে দীনপ্রাণ, কী মোহের লাগি
রেখেছিস মিছে স্নেহ রে।

বলাকা কাব্যের গতিচেতনার ভিন্নতর ফলশ্রুতি তার নবীনবরণ ও যৌবনচেতনার কবিতাগুলিতে। সকল আপাত শান্তি এবং স্থবিরত্ব থেকে মুক্তির জন্য কবি আহ্বান করেছিলেন নবীনকে, যে-নবীনের আগমন সম্ভাবিত

হবে মৃত্যু দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়ে, যে নবীনকে বরণ করবার জন্ত কণ্টকবিদ্ধ পদে চক্তাক্ত চরণে রৌদ্রতাপদগ্ধ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে চলতে হবে। সেই নবীনের আবাহনী সুরু হয়েছে বলাকা রচনার অনেক আগেই। তারই পূর্বব্যক্ত পদধ্বনি 'কল্পনা' কাব্যের 'বর্ষশেষ' কবিতায়। সমস্ত কবিতাটিই এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় এবং তার মধ্য থেকে বিশেষ ভাবে—

হে নূতন, এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি
পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে—
ব্যাপ্ত করি, লুপ্ত করি, স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে
ঘনঘোরস্তূপে।
কোথা হতে আচম্বিতে মুহূর্তেকে দিক-দিগন্তর
করি অন্তরাল
স্নিগ্ধ কৃষ্ণ ভয়ংকর তোমার সঘন অন্ধকারে
রহো ক্ষণকাল॥

* * *

চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক,
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার—
উদ্দাম পথিক।
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি—
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শতলক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জন করি॥

* *

শ্যেনসম অকস্মাৎ ছিন্ন করে ঊর্ধ্বে লয়ে যাও
পঙ্ককুণ্ড হতে,
মহান মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি করে দাও
বজ্রের আলোতে।

কল্পনা' কাব্যের 'হতভাগ্যের গানে'র মধ্যে প্রায় সমধর্মী চিন্তা

কিসের তরে অশ্রুঝরে কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।

রিক্ত যারা সর্বহারা সর্বজয়ী বিশ্বে তারা,
গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর নয়কো তারা ক্রীতদাস :
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ॥

কবির প্রাক-বলাকা কাব্য থেকে আরও অসংখ্য উদাহরণ উদ্ধৃত করে দেখানো যায় যে কবির গতিচেতনা এবং নবীনবরণ-যৌবনচেতনা 'প্রাপ্তি পর্যায়' পর্যন্ত সুস্পষ্ট পরিচয় নিয়ে প্রসারিত। কবির মানবচেতনা সম্পর্কেও ঐ একই কথা সত্য। নানা ভাবে নানা ভঙ্গিতে নানা রূপে এবং উপলব্ধির বৈচিত্র্যে কখনও ব্যক্তি মানুষ কখনও সমষ্টিবদ্ধ মানুষ গভীর সহানুভূতি, প্রীতি ও শ্রদ্ধায় তাঁর কাব্যে প্রতিষ্ঠিত। গভীর ভাবে বিচার করতে গেলে তাঁর প্রত্যেক কবিতার মর্মবাণীই হচ্ছে মানবপ্রত্যয়। বলাকা, প্রাক-বলাকা এবং উত্তর-বলাকা সকল কাব্যেই তার অজস্র পরিচয়। আমরা কবিতার উদাহরণ না দিয়ে প্রাক-বলাকা মানবিক পরিচয় চিহ্নিত কিছু কবিতার নাম করছি—

প্রস্তুতি পর্যায়ের কবিতায়: প্রভাত উৎসব (প্রভাত সংগীত), প্রাণ (কড়ি ও কোমল)।

প্রাপ্তি পর্যায়ের কবিতায়: বধূ, গুপ্ত প্রেম, ভৈরবী গান (মানসী), সমুদ্রের প্রতি, পুরস্কার, বসুন্ধরা (সোনার তরী), এবার ফিরাও মোরে, পুরাতন ভৃত্য, দুই বিঘা জমি, স্বর্গ হইতে বিদায় (চিত্রা), বৈরাগ্য, দুর্লভ জন্ম (চৈতালি), দেবতার গ্রাস, পূজারিনি, বন্দীবীর (কথা), গান্ধারীর আবেদন, নরকবাস, কর্ণকুন্তীসংবাদ (কাহিনী), যথাস্থান, কবির বয়স (ক্ষণিকা), মুক্তি, দীক্ষা, ত্রাণ, ন্যায়দণ্ড, প্রার্থনা (নৈবেদ্য), প্রবাসী (উৎসর্গ)।

কিন্তু গতি পর্যায়ের ঠিক আগের পর্যায়, 'সংশয় পর্যায়ে' কবির উক্ত মানসিকতার বৈশিষ্ট্যগুলি অবক্ষয়িত, তাঁর গতিচেতনা স্তব্ধ, যৌবনচেতনা নির্বাপিত এবং মানবচেতনা আচ্ছন্ন বলে সমালোচকগণ রায় দিয়েছেন। তখন কবি প্রতিভার অজ্ঞাতবাসের কাল। দীপ্ত জীবন-প্রত্যয় থেকে তখন সংশয়ের মধ্যে নিমজ্জন, জীবন থেকে পলায়ন, মানুষকে ত্যাগ করে ঐশ্বরিক বিশ্বাসের মধ্যে আশ্রয় অন্বেষণ,—এটি বহু সমালোচকের সিদ্ধান্ত।

বিশেষ করে এই পর্বের পরই 'গতি' পর্বের আগমন তাই তাঁদের কাছে কেমন যেন বিস্ময়কর মনে হয়েছে। সেইজন্যই হঠাৎ বলাকা কাব্যখানি

অনেকের কাছে অভিনব লাগে। মনে হয় এ যেন নবাগত, আগে বুঝি এই কাব্যের ভাবচেতনার কোন প্রস্তুতি ছিল না। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর মতে, এ-সময় কবিপ্রতিভার বনবাস। তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ উপাদান মানবের সঙ্গে একাত্মবোধ। তা এ সময় বাধাগ্রস্ত ও অবলুপ্ত। এ-সময় কবি বিশ্রাম-প্রত্যাশী, অবকাশের জন্য আকাঙ্ক্ষিত। বলাকার চেতনার সঙ্গে এই পর্যায়ের চেতনা সম্পূর্ণ বিপরীত—এটিই অধ্যাপক বিশী ও অন্যান্য অনেক সমালোচকদের রায়।

এই পর্যায়ের চারখানি রচনা থেকে উক্ত নিরুদ্যম, গতিহীনতা ও মানব-চেতনাবিচ্ছিন্ন ঈশ্বর ও প্রকৃতি চিন্তার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। রচনা কয়খানির একখানি কাব্য, 'খেয়া' ও অপর তিনখানি সংগীত সংকলন, —'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি'।

'খেয়া' কাব্যে গতিহীন অবকাশ-আকাঙ্ক্ষার বহু পরিচয় রয়েছে। 'বিদায়' কবিতায় কবির প্রার্থনা—

বিদায় দেহো, ক্ষম আমায় ভাই।
কাজের পথে আমি তো আর নাই।
এগিয়ে সবে যাও-না দলে দলে,
জয়মাল্য লও না তুলি গলে,
আমি এখন বনচ্ছায়াতলে
অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই।
তোমরা মোরে ডাক দিও না ভাই।

কিংবা 'পথের শেষ' কবিতায়—

অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ,
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।

'সমাপ্তি' কবিতায়—

হাটের সাথে ঘাটের সাথে আজি
ব্যবসা তোর বন্ধ হয়ে গেল।
এখন ঘরে আয়রে ফিরে মাঝি,

আঙিনাতে আসনখানি মেলো।
ভুলে যারে দিনের আনাগোনা,
জালতে হবে সারারাতের আলো।
শ্রান্ত ওরে, রেখে দে জাল-বোনা,
গুটিয়ে ফেলো সকল মন্দ-ভালো।

আর গীতি সংকলনত্রয়ীতে মানবজীবন-প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে ঐশ্বরিক প্রত্যয়ের আশ্রমে প্রত্যাবর্তন। সুতরাং অন্তত এই অব্যবহিত পূর্ববর্তী পর্যায়টির ক্ষেত্রে বলা যায়, এটি কবির পরবর্তী মহীরুহের বীজ বা বীজের দ্যোতনা ধারণ করে নেই। আমরা পূর্বে যে বলেছি কবির কাব্যজীবনের যে-কোন পর্যায় পূর্ববর্তী পর্যায়েরই বিবর্তিত রূপ, উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে যে এক্ষেত্রে তা খাটে না। এই পর্যায়টি যেন রবীন্দ্র-কাব্যজীবনের সাধারণ নিয়মের একটি ব্যতিক্রম।

কিন্তু সত্যই কি তাই? সমালোচকদের অভিমত স্বীকার করে নেওয়ার আগে এই পর্যায়ের কাব্যগুলি আরও একবার পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার। এবং সেই পরীক্ষা করতে গেলেই দেখা যাবে এই পর্যায়ে সংশয়, প্রদোষের আলো-আঁধারি, মনুষ্যবিবিক্ত ঈশ্বর-চেতনা, গতিবিরোধী অবকাশ-আকাঙ্ক্ষা আছে বটে, কিন্তু তাকে অতিক্রম করবার ইচ্ছা, গতির ব্যঞ্জনা, মানবচেতনা-মিশ্রিত ঐশ্বরিক চেতনা এবং নূতন করে কর্মের জগতে প্রয়াণ-আকাঙ্ক্ষাও কম তীব্রতার সঙ্গে প্রকাশিত নয়। নিজেদের একটি পূর্বনির্ধারিত মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে অনেক সমালোচক এই পর্যায়ের কাব্যের এই দিকটি উপেক্ষা করেছেন। বলাকা-কব্যের মর্মবাণীর ইঙ্গিতবহ কিছু কবিতার উদাহরণ দেওয়া যাক।

প্রথমে গতি ও নবীনের আগমনী-বিধৃত কবিতার উদাহরণ

(১) আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ে,
ঝড় এল রে আজ—
মেঘের ডাকে ডাক মিলিয়ে
বাজ্ রে মৃদঙ্ বাজ।

আজকে তোরা কী গাবি গান
কোন্‌ রাগিণীর সুরে
কালো আকাশ নীল ছায়াতে
দিল যে বুক পুরে। (ঝড়/খেয়া)

(২) নিশ্বাস রুধে দু চক্ষু মুদে
তাপসের মতো যেন
স্তব্ধ ছিলি যে ওরে বনভূমি,
চঞ্চল হলি কেন।
হঠাৎ কেন রে দুলে ওঠে শাখা,
যাবে না ধরায় আর ধরে রাখা,
ঝট্‌পট্‌ করে হানে যেন পাখা
খাঁচায় বনের পাখি।
ওরে আমলকি ওরে কদম্ব,
কে তোদের গেল ডাকি।
'ঐ যে ঈশানে উড়েছে নিশান
বেজেছে বিষাণ বেগে
আমার বরষা কালো বরষা যে
ছুটে আসে কালো মেঘে।' (চাঞ্চল্য/খেয়া)

(৩) পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দেরে,
খসে যাবার ভেসে যাবার
ভাঙবারই আনন্দ রে।
পাতিয়া কান শুনিস না যে
দিকে দিকে গগন মাঝে
মরণবীণায় কী সুর বাজে
তপন-তারা-চন্দ্রে রে
জ্বালিয়ে আগুন ধেয়ে ধেয়ে
জলবারই আনন্দেরে (৩৬/গীতাঞ্জলি)

(৪) ঈশান কোণেতে ঐ যে ঝড়ের বাণী
গুরু গুরু রবে কী করিছে কানাকানি ;
দিগন্তরালে কোন ভবিতব্যতা
স্তব্ধ তিমিরে বহে ভাষাহীন ব্যথা,
কালো কল্পনা নিবিড় ছায়ার তলে
ঘনায়ে উঠিছে কোন আসন্ন কাজে ।
বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে । (১০০/ঐ)

ঐশ্বরিক উপলব্ধির মাঝে মানবচেতনা—

(১) তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর
নাহি কোনো মানা নাহি কোন ডর,
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছে—
দেখা যেন সদা পাই ।
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই । (৩/ঐ)

(২) বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহার'
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো
নয়কো বনে, নয় বিজনে,
নয়কো আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন তুমি হে প্রিয়
সেথায় আপন আমারো । (৯৪/ঐ)

(৩) আমি চেয়ে আছি তোমাদের সবাপানে ।
স্থান দাও মোরে সকলের মাঝখানে ।
নীচে সব নীচে এ ধূলির ধরণীতে
যেথা আসনের মূল্য না হয় দিতে,
যেথা রেখা দিয়ে ভাগ করা নেই কিছু
যেথা ভেদ নেই মানে আর অপমানে,
স্থান দাও সেথা সকলের মাঝখানে । (১০৪/ঐ)

উদাহরণ অনেক আছে, কিন্তু আর প্রয়োজন নেই ।

সুতরাং এখন এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় বলাকার ভাবচেতনা প্রাক বলাকা সকল পর্যায়েই বর্তমান ছিল। কবি মানসস্থিত গতিচেতনা ও মানব চেতনার বীজটি ক্রম-অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে তার ধারা বর্তমান রেখে বলাকায় এসে পৌঁছিয়েছে এবং এখানে এসে গভীরতর ও পরিণততর বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। বিবর্তনের এই ধারাসূত্র কোথাও ছিন্ন হয়নি, এমনকি সংশয় পর্বেও নয়। তাই বলাকা রবীন্দ্রকাব্যধারায় হঠাৎ আগত নবাগত নয়, পূর্বতন ধারারই ব্যক্ততর ফলশ্রুতি।

বলাকা শুধু পূর্বতন ধারার পরিণতি মাত্র নয়, পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ ভাব চেতনার বীজরূপ এবং সংযোগ-সূত্রও বটে। গতি-পর্যায়ে আর যে কাব্য গ্রন্থগুলির নাম আমরা করতে পারি, তারা যথাক্রমে 'পলাতকা', 'শিশু ভোলানাথ', 'পূরবী', 'মহুয়া', 'বনবাণী' ও 'পরিশেষ'। এদের সবগুলির মধ্যেই ঐ একই গতি ও মানবচেতনার বাণী অনুস্যূত, কোথাও তত্ত্বরূপে, কোথাও ব্যাখ্যারূপে, কোথাও উপলব্ধিরূপে, কোথাও বা উদাহরণরূপে। 'পলাতকা'য় গতি চেতনা উদাহরণরূপে প্রকাশিত।

একদা এক বিকাল বেলায়
আমলকি বন অধীর যখন ঝিকিমিকি আলোর খেলায়,
তপ্ত হাওয়া ব্যথিয়ে ওঠে আমের বোলের বাসে,
মাঠের পরে মাঠ হয়ে পার ছুটল হরিণ নিরুদ্দেশের আশে।
সম্মুখে তার জীবন মরণ সকল একাকার।
অজানিতের ভয় কিছু নেই আর।
.. ..
রক্তে তাহার কেমন এলোমেলো
কিসের খবর এল।
বুকে যে তার বাজল বাঁশি বহুযুগের ফাগুন দিনের সুরে—
কোথায় অনেক দূরে
রয়েছে তার আপন চেয়ে আরও আপন জন
তারই অন্বেষণ।
জন্ম হতে আছে যেন মর্মে তারি লেগে,
আছে যেন ছুটে চলার বেগে,
আছে যেন চল-চপল চোখের কোণে জেগে। (পলাতকা/পলাতকা)

প্রতি পলাতক মুহূর্তের এক দীর্ঘ প্রবাহ পলাতকা কাব্য। তা-ছাড়া পলাতকার কবিতা আকারের ছোট গল্পগুলি (মুক্তি, ফাঁকি, নিষ্কৃতি প্রভৃতি) কবির মানবপ্রীতির হীরক-দীপ্ত উদাহরণ ধারণ করে আছে।

পরবর্তী কাব্য 'শিশু ভোলানাথে' ধ্বংসের মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকে রক্ষা করবার ও মুক্তি দেওয়ার ব্যঞ্জনা বলাকার 'চঞ্চলা' কবিতাকে স্মরণ করায়। প্রথম কবিতাতেই (তারও নাম 'শিশু ভোলানাথ') তার পরিচয়—

ওরে মোর শিশু ভোলানাথ
তুলি দুই হাত
যেখানে করিস পদপাত
বিষম তাণ্ডবে তোর লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় সব ·
আপন বিভব
আপনি করিস নষ্ট হেলাভরে ;
প্রলয়ের ঘূর্ণচক্র 'পরে
চূর্ণ খেলেনার ধূলি ওড়ে দিকে দিকে ;
আপন সৃষ্টিকে
ধ্বংস হতে ধ্বংস মাঝে মুক্তি দিস অনর্গল,
খেলারে করিস রক্ষা ছিন্ন করি খেলেনা শৃঙ্খল।

বলাকা কাব্যের ৩৬ সংখ্যক কবিতায় (বলাকা) বুনো হাঁসের দল যে 'বেগের আবেগ' সৃষ্টি করেছিল, তারই সম্প্রসারিত রূপ পরবর্তী কাব্য 'পূরবী'র 'ঝড়' কবিতায়—

তোরা বলেছিলি তাকে
'বাঁধিয়াছি ঘর
মিলেছে পাখির ডাকে
তরুর মর্মর।
পেয়েছি তৃষ্ণার জল,
ফলেছে ক্ষুধার ফল,
ভাণ্ডারে হয়েছে ভরা লক্ষ্মীর সঞ্চয়।'
ঝড় বিদ্যুতের ছন্দে
ডেকে ওঠে মেঘমন্দ্রে
'নয়, নয়, নয়।'

বলে ঝড় অবিশ্রান্ত
'তুমি পান্থ' আমি পান্থ—
জয়, জয়, জয়।'

'মহুয়া' কাব্যে নরনারীর দ্বৈত জীবনছন্দে একই গতির উপলব্ধি—

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।

নাই আমাদের সঞ্চিত ধনরত্ন
নাইরে ঘরের লালনললিত যত্ন।
পথপাশে পাখি পুচ্ছ নাচায়
বন্ধন তারে করি না খাঁচায়—
ডানা-মেলে-দেওয়া মুক্তি প্রিয়ের কূজনে দুজনে তৃপ্ত।
আমরা চকিত অভাবনীয়ের ক্বচিৎ কিরণে দীপ্ত॥

'বনবাণী'তে ক্রমবিকাশ তত্ত্বের উদাহরণ। বৃক্ষের মধ্য দিয়ে প্রাণের ক্রম-অভিব্যক্তির পথ-পরিক্রমা। অন্ধ ভূমিগর্ভে পিষ্ট প্রাণকে বৃক্ষই মুক্তি দেয় অনন্ত আকাশ পরিপ্রেক্ষায়। এই উপলব্ধির কাব্যরূপ উক্ত কাব্যের 'বৃক্ষবন্দনা'য়—

অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ আদিপ্রাণ—
ঊর্ধ্বশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ-'পরে। আনিলে বেদনা
নিঃসাড় নিঠুর মরুস্থলে॥......

যে জীবন
মরণতোরণদ্বার বারম্বার করি উত্তরণ
যাত্রা করে যুগে যুগে অনন্তকালের তীর্থপথে
নব নব পান্থশালে বিচিত্র নূতন দেহরথে,
তাহারি বিজয়ধ্বজা উড়াইলে নিঃশঙ্ক গৌরবে
অজ্ঞাতের সম্মুখে দাঁড়ায়ে।

এবং এই পর্যায়ের শেষ কাব্য 'পরিশেষে'ও ঐ একই চলমানতার বাণী, একই গতির বার্তা—

'যেয়ো না, যেয়ো না'বলি কারে ডাকে ব্যর্থ এ ক্রন্দন।
কোথা সে বন্ধন
অসীম যা করিবে সীমারে।
সংসার যাবারই বন্যা, তীব্রবেগে চলে পরপারে,
এ পারের সব-কিছু রাশি রাশি নিঃশেষে ভাসায়ে,
কাঁদায়ে হাসায়ে।
অস্থির সত্তার রূপ ফুটে আর টুটে;
'নয় নয়' এই বাণী ফেনাইয়া মুখরিয়া উঠে
মহাকাল সমুদ্রের 'পরে।
সেই স্বরে
রুদ্রের ডম্বরুধ্বনি বাজে
অসীম অম্বর-মাঝে—
'নয় নয় নয়।'
ওরে মন, ছাড়ো লোভ, ছাড়ো শোক ছাড়ো ভয়।
সৃষ্টি নদীধারা তার নিরন্ত প্রলয়। (ধাবমান)

কবিতাটি 'ঈশোপনিষদে'র প্রথম শ্লোক এবং 'সোনার তরী'র 'যেতে নাহি দিব'কে স্মরণ করায়। বলাকার 'ঝড়ের খেয়া' কবিতার শেষে বা 'ছবি' কবিতায় গতির কেন্দ্রে যে স্থিরপ্রত্যয়ের কথা আছে, যে 'একে'র পটপ্রেক্ষায় সকল গতির সম্প্রসারের কথা আছে, এই 'এক', সেই কেন্দ্রীয় অপরিবর্তনীয় সত্য-ভূমির ইঙ্গিতও এই সকল কাব্যগ্রন্থেও আছে। 'পূরবী'র 'সাবিত্রী' কবিতা, 'পরিশেষে'র 'প্রণাম' বা 'বনবাণী'র পূর্বোল্লেখিত 'বৃক্ষবন্দনা' সেই পরিচয়বাহী। অতএব এখন এ-সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে বলাকা কাব্য কবির পূর্বের কাব্যধারার পরিণতি এবং পরবর্তী কাব্যধারার প্রেরণা। কিংবা বলা যায় পূর্বাপর কাব্যধারার গতিচেতনার ও বিবর্তধারার এটি একটি সংযোগ সূত্র (connecting link) বা ক্রমবিকাশ-সরণিরই একটি পর্যায়। এটি কোন হঠাৎ প্রক্ষিপ্ত নবাগত-ভাববাহী বিচ্ছিন্ন কাব্যখণ্ড নয়।

গতি ও মানবচেতনা প্রভৃতি ছাড়াও বলাকা কাব্যের অন্যান্য আরও কিছু কিছু বক্তব্যের পূর্বতন উপস্থাপনা যে কবির পূর্ববর্তী কাব্যে আছে তার

একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করছি। কবির বলাকা কাব্যের ২৩ সংখ্যক কবিতায় (দুই নারী) কবির দুই নারী তত্ত্বের ব্যাখ্যা। এই তত্ত্বের উদাহরণ কবির বহু পূর্বে রচিত 'চিত্রা' কাব্যের 'রাত্রে ও প্রভাতে' কবিতায়। চিত্রায় যেন observation এবং বলাকার inference। বলাকার কবিতাটিতে কবি মোহিনী নারী সত্তার কথা বললেন,—

একজন তপোভঙ্গ করি
উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি
নিয়ে যায় প্রাণ মন হরি—
দু হাতে ছড়ায়ে তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে,
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে,
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।

এই শ্রেণীর উদাহরণ উৎকীর্ণ হয়ে ছিল 'চিত্রা'র কবিতাটিতে—

কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্নানিশীথে কুঞ্জকাননে সুখে
ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা ধরেছি তোমার মুখে।
তুমি চেয়ে মোর আঁখি-'পরে
ধীরে পাত্র লয়েছ করে,
হেসে করিয়াছ পান চুম্বনভরা সরস বিম্বাধরে,
কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্নানিশীথে মধুর আবেশ ভরে।

বলাকায় দ্বিতীয় প্রকার (জননী শ্রেণীর) নারী—

আরজন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশির স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়,
হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায়;
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্বাদ-পানে
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্য সুধায় মধুর
ফিরাইয়া আনে ধীরে
জীবনমৃত্যুর
পবিত্র সংগমতীর্থতীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে।

আর এর উদাহরণ 'চিত্রা'য়—

> আজি নির্মলবায় শান্ত উষায় নির্জন নদীতীরে
> স্নান-অবসানে শুভ্রবসনা চলিয়াছ ধীরে ধীরে।
> তুমি বামকরে লয়ে সাজি
> কত তুলিছ পুষ্পরাজি,
> দূরে দেবালয়তলে উষার রাগিনী বাঁশীতে উঠিছে বাজি।
> * * * একি মঙ্গলময়ী মূরতি বিকাশি প্রভাতে দিতেছ দেখা।

অতএব বলা যেতে পারে বলাকা অপরিচিত পথিক নয়। হয়তো তার বাইরের পোষাকের পরিবর্তন হয়েছে। নূতন রূপে সে এবার আসর জমিয়েছে। কিন্তু ভিতরের মর্ম এক।

কিন্তু তবুও একটু চিন্তার অবকাশ আছে। বলাকার ভাব-ভাবনা পুরাতনেরই পরিণতি এবং পরবর্তীর উৎস বটে, কিন্তু তার কি কোনই অভিনবত্ব নেই? আছে। ফল যেমন ফুলেরই পরিণতি কিন্তু ফুল নয়, আবার ফল যেমন বীজের জন্মদাতা বটে, কিন্তু বীজ নয়,—ফুল এবং বীজের থেকে ফল পৃথক, অনন্য এবং আপন বিশিষ্টতায় পরিচ্ছিন্ন তেমনি বলাকা কাব্যও। সে পূর্বের পরিণতি এবং পরবর্তীর উৎস বটে, রবীন্দ্র কাব্যধারায় সে পূর্বপরিচয়ের চিহ্নধারী পথিক বটে, তবুও সে আপন বৈশিষ্ট্যে অনন্য এবং অভিনব। সেই বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করলে বলতে হয় রবীন্দ্রকাব্যবংশলতিকায় সে নবজাতক, যদিও পিতৃপুরুষের পরিচয়-বঞ্চিত নয়। এতক্ষণ পূর্ব-পর্বের সঙ্গে কোথায় সে এক তা আলোচনা করেছি, এখন কোথায় সে অনন্য ও অভিনব তা দেখানর চেষ্টা করছি।

এতদিন পর্যন্ত কবির যে কাব্যসংস্কার তা মুখ্যত আবেগচালিত, ভাবাত্মক। জন্মসূত্রে লব্ধ অনুভূতি এবং পরিবেশ থেকে স্বত-সঞ্চারিত আকৃতিগুলি এতদিন পর্যন্ত তাঁর কবিমানসকে নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং তার ফলে তাঁর কবিতাগুলি প্রধানত আবেগের মধ্য দিয়ে উৎসারিত, বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত নয়। কিন্তু বলাকা রচনার কালে এই বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন। বলাকায় কবির বক্তব্যগুলি বুদ্ধিদীপ্ত, মুখ্যত তারা জ্ঞানের সামগ্রী, যদিও কবির অপরিসীম ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত তাকে ভাবাত্মক অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠা দিতে সমর্থ হয়েছে।

এই কাব্যে কবির মুখ্য বক্তব্য দুটি,—গতিচেতনা এবং মানবচেতনা। এর আগেও কবির কাব্যে এই দুই চেতনার প্রকাশ হয়েছে, আমরা দেখেছি। কিন্তু সেই কবিতাগুলি কবির স্বাভাবিক ভাবাত্মক অনুভূতিগুলিকে ধরে রেখেছে। চলমান জীবনের ছবি এবং মানুষের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক ও জন্মগত ভালবাসা ও সহানুভূতিই সেই কবিতগুলিকে জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু বলাকার গতিচেতনা ও মানবচেতনা ঠিক তেমন অবচেতন-গ্রহণের ব্যাপার মাত্র নয়। এর বক্তব্যগুলি সমকালীন বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক ও রাষ্ট্রিক চিন্তা ও বাস্তব অবস্থা দ্বারা পরীক্ষিত এবং তারই বুদ্ধিদীপ্ত বিজ্ঞাননিষ্ঠ প্রকাশ। তাই কবিতাগুলির আবেদন যত emotional তার থেকে অনেক বেশী intellectual।

এই কাব্যের গতিচেতনার পশ্চাতে কবির অনুভূতিনির্ভর গতিচেতনা অপেক্ষা সমকালে বিজ্ঞান জগতে উপলব্ধীকৃত গতিচেতনাই প্রধান। আগেই বৈজ্ঞানিক ডারউইনের জৈব-বিবর্তনবাদের কথা বলেছি! তার সঙ্গে পদার্থ বিজ্ঞানে ও জ্যোতিবিজ্ঞানে উপলব্ধীকৃত গতিচিন্তাও এই সময়ে বিশেষ ভাবে চিন্তাশীল সমাজকে নাড়া দিচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ কবি বটে, কিন্তু সমকালীন বিজ্ঞান-দর্শনের সঙ্গে তাঁর সচেতন পরিচয় যথেষ্ট গভীর। আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ (Religion of Man দ্রষ্টব্য) আমরা ভুলতে পারি না। 'বিশ্ব পরিচয়' বলে জ্যোতির্বিজ্ঞানের আশ্চর্য গ্রন্থখানি তাঁরই রচনা। এই বৈজ্ঞানিক চেতনাই এই কাব্যের গতিচেতনার মূলে, আবেগ-উদ্বেলিত কোন কবিভাব তার উৎস নয়। কবির প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্তব্য ও উদাহরণগুলি বিজ্ঞানের এক একটি সিদ্ধান্তেরই প্রাতিক রূপায়ণ। যেমন চঞ্চলা (৮ সংখ্যক) কবিতার প্রথম স্তবকের একটি পংক্তি 'বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে/পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে'। এটি জ্যোতির্পদার্থ বিজ্ঞানের নক্ষত্র-গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টি সম্পর্কে যে 'Coagulation Theory' আছে তারই ইঙ্গিতবহ। বিশ্বে আপন আপন বৃত্তপথে নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ যে অনাদি কাল থেকে পরিভ্রমণশীল এই বৈজ্ঞানিক বক্তব্যের পরিচয় চঞ্চলার নিম্নের পংক্তি কয়টিতে—

ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্যচন্দ্র তারা যত
বুদ্‌বুদের মতো।

সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর যে বার্ষিক গতি, তার ফলেই হয় ঋতু পরিবর্তন এবং ঋতু পরিবর্তনের ফলেই পৃথিবীর উদ্ভিদ জগতে ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিজ্জ, পুষ্প প্রভৃতি প্রকাশিত হতে থাকে। এই ভৌগোলিক, জ্যোতির্বিজ্ঞানিক এবং উদ্ভিদবিজ্ঞানিক বক্তব্য প্রকাশিত নিম্নের কাব্যাংশে, যখন কবি চঞ্চলাকে বলেন, তোমার নিরুদ্দেশ চলার গতিতে—

বারম্বার ঝরে ঝরে পড়ে ফুল
জুঁই চাঁপা বকুল পারুল
পথে পথে
তোমার ঋতুর থালি হতে।

আলোচ্য কাব্যের মূলভিত্তি যেমন উক্ত বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি তেমনি সমকালীন সামাজিক-রাষ্ট্রিক বিশ্বপরিস্থিতিও বটে। এই কাব্যে মানব চেতনা কেবলমাত্র কবির অবচেতন মানবপ্রীতি নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক রাষ্ট্রিক কারণের সংমিশ্রণও এই চেতনার মূলে। মানব চেতনা প্রসঙ্গে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আমরা করেছি। জৈববিবর্তনের পথে প্রাণের উদ্ভব বিশ্বকে মহাজড়ত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য এবং বিবর্তনের পথধারে সেই প্রাণের মানব সত্তায় পরিণতি বিশ্বস্থ কেন্দ্রীয় চেতনশক্তির ক্রিয়ায়—এই দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি এই কাব্যের মানব চেতনায়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে Hibbert Lectures—The Religion of Man-এ অপূর্ব কাব্যিক ইংরেজী গদ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্য নির্ভর তাঁর মৌলিক দার্শনিক বক্তব্যের যে পরিচয় ও ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন, তারই পূর্ব সূচনা বলাকা কাব্যের কবিতায়। Religion of Man-এ কবি বলেছিলেন—

Light, as the radiant energy of creation, started the ring-dance of atoms in a diminutive sky, and also the dance of the stars in the vast, lonely theatre of time and space. The planets came out of their bath of fire and basked in the sun for ages. They were the thrones of the gigantic Inert, dumb and desolate, which knew not the meaning of its own blind destiny and majestically frowned upon a future when its monarchy would be menaced.

Then came a time when life was brought into the arena in the tiniest little monocycle of a cell. With its gift of

growth and power of adaptation it faced the ponderous enormity of things, and contradicted the unmeaningness of their bulk. It was made conscious not of the volume but of the value of existence, which it ever tried to enhance and maintain in many-branched paths of creation, overcoming the obstructive inertia of Nature by obeying Nature' law.

But the miracle of creation did not stop here in this isolated speck of life launched on a lonely voyage to the Unknown. A multitude of cells were bound together into a larger unit, not through aggregation, but through a marvellous quality of complex inter-relationship maintaining a perfect co-ordination of functions. This is the creative principle of unity, the divine mystery of existence, that baffles all analysis. The larger co-operative units could adequately pay for a greater freedom of self-expression, and they began to from and develop in their bodies new organs of power, new instruments of efficiency. This was the march of evolution ever unfolding the potentialities of life.

But this evolution which continues on the physical plane has its limited range. All exaggeration in that direction becomes a burden that breaks the natural rhythm of life, and those creatures that encouraged their ambitious flesh to grow in dimensions have nearly all perished of their cumbrous absurdity.

Before the chapter ended Man appeared and turned the course of this evolution from an indefinite march of physical aggrandisement to a freedom of a more subtle perfection. This has made possible his progress to become unlimited, and has enabled him to realize the boundless in his power. (The Religion of Man, 5th Impression of Ist publication by George Allen & Unwin, pp. 13, 14).

উপরিউক্ত দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি থেকে বুঝতে পারা যাবে সমকালীন বৈজ্ঞানিক চিন্তার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে সম্পূর্ণরূপে ভিত্তি রূপে গ্রহণ করে নিজের মৌলিক দৃষ্টিতে তার বিশিষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন কবি। প্রতিভাপরিস্রুত এই বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির কাব্যিক রূপায়ন বলাকা কাব্যের মানবচেতনাশ্রিত কবিতায়, যেখানে তিনি বলেছেন—

আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম—
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দকুসুম।
আমায় তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে।
আমায় তুমি মরণ-মাঝে লুকিয়ে ফেলে
ফিরে ফিরে নূতন করে পেলে।
আমায় দেখবে বলে তোমার অসীম কৌতূহল—
নইলে তো এই সূর্য তারা সকলই নিষ্ফল।

শুধু বৈজ্ঞানিক চেতনাই নয়, সমকালীন রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থাও কবির বলাকা কাব্যের মানবতার ভিত্তিভূমি রচনা করেছে গতিতত্ত্ব ও মানবচেতনা প্রসঙ্গে আমরা সে কথাও আগে বলেছি।

এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষে না হলেও পরোক্ষে কবিতাগুলি রচনার উৎস মুখ্যত এই বিজ্ঞান-ইতিহাস-সমাজনীতি-রাষ্ট্রনীতি পরিশীলিত একটি শিক্ষিত সচেতন ব্যক্তিমন, আবেগ-আকুলিত ভাবুকমন নয়। এই কাব্যের বক্তব্যগুলি জ্ঞান-জগতের যত, ভাবজগতের তত নয়। এখানেই এর অভিনবত্ব এবং পূর্ববর্তী ধারার সঙ্গে পার্থক্য। কেন্দ্রীয় বক্তব্য একই, কিন্তু উপলব্ধির পার্থক্যে এবং প্রকাশভঙ্গির বৈচিত্র্যে কবিতাগুলি নব পরিচয় নিয়ে এসেছে। রবীন্দ্র-সাহিত্য-ধারায় ঠিক এমন 'বুদ্ধির কাছে আবেদনসমন্বিত' সচেতন intellectual বৈশিষ্ট্যপ্রধান কাব্য আগে পাওয়া যায়নি।

এই বৈশিষ্ট্যের জন্য কবির পূর্বের গীতি কাব্যের স্থলে এখানে আমরা পেলাম দীপ্তিকাব্য। এ আমাদের রসের দ্রাবণে গলিয়ে দেয় বটে, কিন্তু তার থেকে অনেক বেশী আমাদের নব বোধে উদ্দীপ্ত করে, আমাদের কাছে বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাসের বাস্তব বুদ্ধি-পরীক্ষিত সত্যকে (কেবল মাত্র পরা সত্যকে নয়) উন্মোচিত করে। এর subjective আবেদনকে অস্বীকার করা যায় না বটে, কিন্তু এর প্রধান আবেদন, objective, নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব-দর্শন। যেখানে কবি 'আমি' বলে নিজের কথা বলছেন, সে-কথাও ব্যক্তি-কবির কথা নয়, মানুষের প্রতিনিধি বা মনুষ্যসমাজের unit-রূপে রবীন্দ্রনাথ নামক একজনের কথা। এই দীপ্তি-বৈশিষ্ট্য পূর্বতন কাব্য-বিবর্তন ধারার ক্ষেত্রে একটি Mutation (হঠাৎ নববৈশিষ্ট্য-সমন্বিত গুণগত পরিবর্তনধারী অভিব্যক্তি)-এর মত বলাকাকে অভিনবত্ব দিয়েছে।

আর তার ফলে আঙ্গিকের দিক দিয়েও কাব্যটি অভিনব হয়ে উঠেছে। 'বাণীরূপ' আলোচনায় তা আমরা দেখিয়েছি। 'মুক্তক ছন্দ' রবীন্দ্রনাথের এতদিন প্রচলিত কাব্য ছন্দের ধারাবহির্ভূত নবতর ছন্দ,—আলোচ্য কাব্যের বক্তব্য ধারণেরই উপযুক্ত আঙ্গিক। এই আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্যও রবীন্দ্রকাব্যধারা-স্রোতে কাব্যখানিকে নবজাতকের মহিমায় অভিষিক্ত করেছে। এই আঙ্গিকই পরবর্তীকালে তাঁর গদ্য ছন্দের জন্মদাতা।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি পরবর্তীকালে বিবর্তিত বিবর্ধিত ও পরিবর্তিত রূপে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কাব্যধারায় সঞ্চারিত, কিন্তু সে প্রসঙ্গান্তরের কথা।

গ্রন্থনির্দেশ

History of English Literature--Legouis & Cazamian.

The Origin of Species—Charles Darwin.

The Religion of Man—Rabindranath Tagore.

উপনিষদ গ্রন্থাবলী (১ম ও ২য় ভাগ) উদ্বোধন সংস্করণ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস—ভারত সরকারের শিক্ষাধিকার।

কালান্তর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আধুনিক সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ—ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র।

বাংলা সাহিত্য বিকাশের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলা সাহিত্য—মোহিতলাল মজুমদার।

রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা—ডঃ নীহার রঞ্জন রায়।

কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়
—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত—ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলা ছন্দের মূলসূত্র—অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত—ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত।

রবীন্দ্র কাব্য-কথা—বারীন্দ্র বসু।